Journal of Rajshahi College, **Vol. 1, Nos. 1 & 2, 2023, pp. 183-211**

মহাকালগড় থেকে রামপুর-বোয়ালিয়া: রাজশাহীর স্থান নাম পর্যালোচনা

মোঃ শাহ তৈয়বুর রহমান চৌধুরী*

Abstract

হযরত শাহ মখদুম (রহ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত, স্বচ্ছ-সলিলা-স্রোতস্বিনী পদ্মার উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত এক অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর বিভাগীয় শহর রাজশাহীর প্রাচীন নাম মহাকালগড়। বর্তমান সময়ের দরগাপাড়া, পাঠানপাড়া, হোসেনীগঞ্জ এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত মহাকালগড় প্রথমে বোয়ালিয়া এবং পরে রামপুর-বোয়ালিয়া নামে খ্যাতি লাভ করে। আরো পরে এই বর্ধিষ্ণু জনপদটির নামকরণ হয় রাজসাহী; এরপরে রাজসাহী থেকে বর্তমানের রাজশাহী। শহরটির নামকরণের নির্ভরযোগ্য কোনো লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না, নেই কোনো শিলালিপিও। অবশ্য এখানকার স্থাননামের উদ্ভব নিয়ে স্থানীয় ইতিহাসবিদ্‌গণ মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তা সত্ত্বেও এখানকার স্থান নামসমূহের উৎপত্তি নিয়ে মতানৈক্য রয়েই গেছে। মূলত এদের লেখনি প্রবাদ–জনশ্রুতি ভিত্তিক এবং অনুমান নির্ভর। অবশ্য নতুন কোনো প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এদের মতামত বিবেচনায় রাখা জরুরি। আলোচ্য প্রবন্ধে রাজশাহীর স্থাননামের প্রচলিত মতবাদসমূহ পর্যলোচনার প্রয়াস পাওয়া গেছে।

Keywords: *স্থান নাম*, *মহাকালগড়*, *রামপুর-বোয়ালিয়া*, *বেলদারপাড়া*, *সিরুসারপাড়া*

রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের একটি জনপদ। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম কাব্যগ্রন্থ, মিনহাজ-ই-সিরাজ রচিত তবকাত-ই-নাসিরী, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ও দিগ্বিজয় নামক গ্রন্থসমূহে বরেন্দ্র ভূমির উল্লেখ আছে। এছাড়া বৈদ্য দেবের কমৌলি-লিপি, সিলিমপুর শিলালিপি, তর্পণদীঘি ও মাধাইনগর পট্টোলিতেও বরেন্দ্রীর উল্লেখ আছে। এসব উৎস হতে জানা যায় যে, বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, অবিভক্ত দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা (পাদুম্বা) জেলার অধিকাংশ এবং রংপুর জেলার কিয়াদংশ বরেন্দ্র বা বরিন্দ নামে পরিচিত ছিলো।[১] বর্তমানে রাজশাহী নগরটি যে স্থানে অবস্থিত, সুদূর অতীতে সেখানে কোনো প্রাচীন জনপদ ছিলো না, একথা ঠিক। কিন্তু বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে রাজশাহী ছিলো অতি প্রাচীন স্থান। রাজশাহীর আশেপাশের স্থানগুলো বরেন্দ্রের অন্যান্য

* মোঃ শাহ তৈয়বুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী ৬০০০, বাংলাদেশ; ই-মেইল: mstrc1966@gmail.com

♦ **Article** received on 15 August 2023, accepted on 10 October 2023

To cite the article: চৌধুরী, মোঃ শাহ তৈয়বুর রহমান (২০২৩)। মহাকালগড় থেকে রামপুর-বোয়ালিয়া: রাজশাহীর স্থান নাম পর্যালোচনা। *Journal of Rajshahi College,* 1(1 & 2), 183-211.

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২), ২য় সং, পৃ. ১১৬।

ঐতিহাসিক স্থানগুলোর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বলেই বিবেচিত হতো। বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে এসব অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে গুপ্ত-পাল-সেন- সুলতানি-নবাবি আমলের রাজা ও প্রশাসকদের সময়ের রাজধানী চিহ্নিত হয়েছে এবং এসব স্থানে রাজধানীর অবকাঠামোর ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হচ্ছে।

রাজশাহীর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে শ্রী কালীনাথ চৌধুরী লিখেছেন, "রাজসাহী অতি প্রাচীন স্থান। ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ... মহাভারতে উত্তর গো–গৃহের উল্লেখ আছে। সেই 'গো-গৃহ' রাজসাহী প্রদেশের উত্তরভাগে ছিলো।... রাজশাহী 'মৎস্য' দেশের অন্তর্গত এবং রাজসাহী যে, মৎস্যাধিপতি বিরাটের রাজ্য ছিলো, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না।... এই রাজসাহী বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত। পদ্মা নদী এবং করতোয়া ও মহানন্দা নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ বরেন্দ্রভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বরেন্দ্রভূমিতে অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কৌলিন্য প্রথানুসারে তাহিরপুর 'অস্তাচল' ও শুশুঙ্গ 'উদয়াচল' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, রাজা বিরাটের সময় হইতে প্রসিদ্ধ সেন বংশীয় রাজাদের সময় পর্যন্ত রাজসাহী হিন্দু রাজার শাসনাধীন ছিলো; তারপর মুসলমান রাজা রাজসাহী অধিকৃত করেন। ... আমরুল পরগণার অন্তর্গত 'নবাবের তাম্বু' নামে একটা গ্রাম আছে। ইহা কথিত আছে যে, রাজসাহী জরিপের সময় রাজা টোডরমল ঐ গ্রামে নিজ তাম্বু স্থাপিত করেন। মোগলবংশীয় সম্রাটের শাসনাধীনেও রাজসাহী ছিলো।"[২]

রাজশাহীর বাগমারা থানার বাইগাছা গ্রামে সম্রাট অশোকের সময়কার ছাপকাটা মুদ্রা (Punch marked coin) পাওয়া গিয়েছে। রাজশাহী শহরের হড়গ্রাম নামক এলাকায় মাটির নিচ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বিরাট বোধিসত্ত্বের মূর্তি। অনুমিত হয় যে, এই অঞ্চলে একসময় প্রচলিত ছিলো মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম।[৩] এছাড়া, রাজশাহী শহরের পশ্চিম ও উত্তরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। নিদর্শনগুলো পাল-সেন, সুলতানি ও নবাবি আমলের। এগুলো হলো দশম শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর।

গোদাগাড়ী থানার মণ্ডয়েল বা মাড়ইলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৪টি মৃত্তিকা স্তূপ আছে। তন্মধ্যে একটি হলো ৪০ ফুট উঁচু। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এখান থেকে জৈন তীর্থাঙ্কর শান্তি নাথের প্রস্তর মূর্তি পেয়েছেন। মনে হয় এই স্থানের অধিবাসীরা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। রাজশাহী নগরের ৩০ কিলোমিটার উত্তরে বর্তমান তানোর থানাধীন বিহারল থেকে একটি বেলে পাথরের সুন্দর দ্বিভুজ অর্ধভগ্ন বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি বরেন্দ্র জাদুঘরে রক্ষিত আছে।[৪] এছাড়া রাজশাহী নগর থেকে ৩২ কি.মি উত্তরে তানোর থানার ধানোরা, পাড়িশোঁ, মাদারিপুর প্রভৃতি গ্রামগুলো পাল যুগে ছিলো একেকটি সমৃদ্ধ

---

[২] শ্রীকালীনাথ চৌধুরী, *রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯) (ড. তসিকুল ইসলাম মৌলভী শামসুদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত *রাজশাহী পরিচিতি*সহ এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন), পৃ. ১৩।

[৩] এবনে গোলাম সামাদ, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত*, (রাজশাহী: প্রীতি প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৬।

[৪] *তদেব*, পৃ. ১৭ ও ১৯।

জনপদ। এসব অঞ্চল থেকে প্রাচীন যুগের নানান নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বে এখানে একটি প্রাচীন দিঘি, ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহার, রাজবাড়ি, পরিখার চিহ্ন ছিলো।[৫]

রামপুর-বোয়ালিয়ার পশ্চিমে কুমোরপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে পাল রাজা কুমার পালের রাজধানী ছিলো। এখনও এর ভগ্নাবশেষ আছে (১৯০১ খ্রি.)। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে এই স্থানে কুমার পালের সময়ের একখানি প্রস্তর লিপি আবিষ্কৃত হয়। ঐ প্রস্তর খণ্ড ভারতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে।[৬] ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, রাজা রামপালের চার পুত্র ছিলো, এরা হলেন- কুমারপাল, বিত্তপাল, রাজ্যপাল ও মদনপাল। রামপালের মৃত্যুর পর কুমারপাল রাজা হন। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে কুমার পালের দুটি ঘটনার কথা উল্লেখিত আছে। বৈদ্যদেব ছিলেন কুমার পালের মন্ত্রী। কুমারপাল পাঁচ বছর (আনু. ১১২৪-১১২৯ খ্রি.) বরেন্দ্র শাসন করেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত কাব্যগ্রন্থে বিত্তপাল ও রাজ্যপালের উল্লেখ আছে এবং এরা বরেন্দ্রে বিদ্রোহ দমনে পিতাকে সাহায্য করেছিলেন। কুমারপালের পর রাজা হন তদীয় পুত্র তৃতীয় গোপাল। তৃতীয় গোপালের পর রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। মদনপাল ১৮ বছর (আনু. ১১৪৩-১১৬১ খ্রি.) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্ব আষ্টাদশ বছর (১১৬১ খ্রিস্টাব্দ) ছিলো তা বল্‌গুদর লিপির প্রমাণে সঠিক করে বলা যায়। এরপর পাল রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে সুদূর কর্ণাট দেশের অধিবাসী কন্নড়ভাষী ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিজয় সেন বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন।[৭]

রাজশাহী শহরের ১২ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তরে অবস্থিত 'দেওপাড়া' নামক গ্রামে সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেনের আদি বাংলা হরফে লিখা ৩২টি অতি দীর্ঘ পক্তির একটি অভিলেখ (শিলালিপি) পাওয়া গেছে। ওই শিলালিপির প্রশস্তির রচয়িতা রাজা লক্ষণ সেনের পঞ্চরত্নের অন্যতম কবি উমাপতি ধর এবং প্রশস্তি খোদাই করেন শিল্পী রাণক শূলোপাণি। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে সি. টি. মেটকাফ (C.T. Metcalfe) এটি আবিষ্কার করেন।

দেওপাড়া অভিলেখে 'বংশ বীর্যশ্রুতামি' অর্থাৎ সেন বংশের অভ্যুদয়ের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। এ অভিলেখে বর্ণিত আছে, বিজয় সেনের নিকট গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গরাজ এবং বীর, নান্য, রাঘব ও বর্ধন নামক কয়েকজন সামন্ত নরপতি পরাজিত হয়েছিলেন। বিজয় সেন যে গৌড়পতিকে পরাজিত করেছিলেন তিনি রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপাল। লিপিমালা থেকে জানা যায়, দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চলের জনৈক সামন্ত সেনের পৌত্র ও হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন পাল বংশীয় রাজাদের কাছ থেকে গৌড় জয় করেন। গৌড় বলতে এখানে বরেন্দ্রকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, মদনপালের সময়কালে পাল রাজাদের আধিপত্য বরেন্দ্র ও বাংলার বাইরে আর কোথাও ছিলো না। ওই অভিলেখে উল্লেখ আছে,

---

[৫] মাহবুব সিদ্দিকী, *শহর রাজশাহীর আদিপর্ব*, (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ১৯।

[৬] শ্রীকালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬।

[৭] মুহম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মোমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবস্তান, ১৯৫১), পৃ. ১০৯-১১২।

বিজয় সেন দেওপাড়ায় একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে একটি হরিহর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেওপাড়ার পদুমশহর দিঘির পূর্বপাড়ে ঐ মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়ে গেছে। বিজয় সেন যে বর্ধন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যেও সেই বর্ধন রাজার প্রসঙ্গ আছে। তাঁর নাম দ্বোরপবর্ধন। রামপাল কৈবর্ত রাজ ভীমকে পরাজিত করে বরেন্দ্র উদ্ধার করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর মতে, রামপাল বরেন্দ্র উদ্ধারে চৌদ্দ জন সামন্ত রাজার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন। অনুমিত হয় যে, এ দ্বোরপবর্ধন রাজশাহীর কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন, যিনি বরেন্দ্র উদ্ধারে পালরাজ রামপালকে সাহায্য করেছিলেন।[৮] পরে তিনি সেন রাজা বিজয় সেনের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। আজও রাজশাহীর 'সিঁদুর কুসুম্বি ' গ্রামটি কৌশাম্বির স্মৃতি বহন করছে।

রাজশাহী শহর থেকে ১৪ মাইল পশ্চিমে এবং দেওপাড়া থেকে ৬/৭ মাইল দক্ষিণে পদ্মানদীর তীরে বিজয়নগর নামে একটি গ্রাম আছে। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর গৌড়লেখমালা গ্রন্থে সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ির পবনদূত কাব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লক্ষণ সেনের দুটি রাজধানীর কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এ দুটি রাজধানী হলো লক্ষণাবতী (গৌড়) ও বিজয়পুর। সেন নৃপতি বিজয় সেন বিজয়পুরে তাঁর স্বাস্থ্য নিবাস বা দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক সেন বংশের রাজধানী বিজয়পুরকে বিজয়নগরের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন।

রাজশাহী শহর থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে মোহনপুর থানা। এখানে ভাতুড়িয়া নামে একটি গ্রাম আছে। ইংরেজ লেখক অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেছেন, ভাতুড়িয়ার হিন্দু রাজা কংশ বা গণেশ গৌড় রাজ্য জয় করে মুসলমান সুলতানকে পরাজিত করে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রান্সিস বুকাননের বিবরণী, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি, নিজাম উদ্দিন বখশি লিখিত 'তবকাৎ-ই-আকবরি এবং গোলাম হোসেন সলিম রচিত রিয়াজুস সালাতিন-এ রাজা গণেশের জীবন ও তাঁর কর্ম সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়। গোলাম হোসেন সলিমের মতে, গণেশ ছিলেন ভাতুড়িয়ার জমিদার। প্রখ্যাত গবেষক এবনে গোলাম সামাদ মনে করেন, রাজা গণেশের ভাতুড়িয়া এবং রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানার ভাতুড়িয়া গ্রাম এক ও অভিন্ন। তিনি বলেন, "রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানায় ভাতুড়িয়া বলে একটি গ্রাম আছে । অতীতে গণেশ নামে এখানে একজন পরাক্রান্ত সামন্ত ছিলেন। এই সামন্ত একসময় গৌড়ে ক্ষমতা দখল করে নেন। হন রাজা গণেশ। অনেকের মতে, রাজা গণেশের নাম অনুসারে হয়েছে 'রাজ-শাহী' নাম। কারণ গণেশ সাধারণভাবে 'রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি হন শাহী বা রাজকীয়।"[৯]

---

[৮] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, 'প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির পরিচয়', মুহঃ মমতাজুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, (রাজশাহী: বিভাগীয় কমিশনারের কাযালয়, ১৯৯৮), পৃ-৫৪১।

[৯] গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সলাতিন*, (সম্পাদনা: শ্রীরাম প্রাণ গুপ্ত, বঙ্গানুবাদ: কাজী মৌ. আব্দুল বাছেত খাঁন, কাজী মৌ. ফকির উল্লাহ, মৌ. আব্দুল করিম খান, মৌলানা গোলাম সারওয়ার), (কলকাতা: অন্তপুর প্রেস, ১৯১১); এবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।

বর্তমানে রাজশাহী শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে রাজাবাড়ী হাটের নিকট একটি টিলা দেখা যায়। সেখানে বহু অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এবং এর আশেপাশে পির-আউলিয়াদের মাজারও পরিদৃষ্ট হয়। এখানে সুলতান হোসেন শাহের আমলে তাঁর কর্মচারী বা শাসনকর্তাগণ বাস করতেন। এতে অনুমান করা যায় যে, এ অঞ্চলে বহু মুসলমানের বসবাস ছিলো।[১০] বর্গী হাঙ্গামার সময়ে গোদাগাড়ী গ্রামে নবাব আলিবর্দি খান একটি বাসভবন নির্মাণ করেন। এই গ্রামে 'কেল্লা বারুইপাড়া' নামে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজও পরিদৃষ্ট হয়। গোদাগাড়ীর কাছে সুলতানগঞ্জ পদ্মা ও মহানন্দার সম্মিলন স্থান। নবাব আলিবর্দি এই গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন বলে এর নাম সুলতানগঞ্জ।

মহাকাল গড়ে শাহ মখদুমের আগমন ও দরগাহ প্রতিষ্ঠা

মখদুম সাহেবের দরগার পূর্বদিকে মাস্টারপাড়া এবং পশ্চিম-দক্ষিণ পার্শ্বে দরগাপাড়া, পাঠানপাড়া ও হোসেনীগঞ্জ। এই সমুদয় এলাকা এক সময়ে মহাকালগড় নামে পরিচিত ছিলো। তৎকালীন মহাকালগড় ছিলো শ্রীরামপুর মৌজার মধ্যে অবস্থিত। বর্তমানে মহাকালগড় নামের অস্থিত্ব নেই। কিন্তু শ্রীরামপুর নামটি রয়ে গেছে। এই মহাকালগড়ের চার মাইল দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে যেতো পদ্মার উপনদী মহানন্দা। কথিত আছে যে, ৫০০/৬০০ বছর পূর্বে পদ্মানদীর স্রোতধারা মহানন্দার আরও দক্ষিণে (ভারতের মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার কাছ দিয়ে) বয়ে যেতো। সেসময় সরদহের ভাটিতে প্রমত্তা পদ্মার সাথে মিলন হতো মহানন্দার। কালে দুই নদী এক হয়ে পদ্মা নদী নাম ধারণ করে। পদ্মা থেকে বারহি, স্বরমঙ্গলা, নারদ প্রভৃতি নদীর সৃষ্টি।

তৎকালে মহাকালগড় ছিলো তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের পীঠস্থান। কিংবদন্তী আছে যে, সুলতানি আমলে এলাকাটি রাজা জানকি রায়ের অধীনস্থ দুই সামন্ত জমিদার দ্বারা শাসিত হতো।[১১] এরা দেওরাজ নামে পরিচিত ছিলো। এদের নাম যথাক্রমে অংশুদেও চান্দভণ্ডী বর্মাগুজ্জভোজ ও অংশুদেও খেজুর চান্দ খড়গ বর্মাগুচ্ছভোজ। এরা দুই সহদোর ভ্রাতা। তান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী এই দুই ভ্রাতা তাদের আরাধ্য দেও বা দৈত্যের এক বিশালাকার কৃষ্ণবর্ণের মূর্তি (মহাকালী মূর্তি) এই গড়ে স্থাপন করেছিল। গড় অর্থ পরিখা বা অরণ্য বেষ্টিত কোনো সংরক্ষিত স্থান বা দুর্গ। সম্ভবত এই মহাকালীর গড় থেকেই 'মহাকালগড়' নামের উৎপত্তি। গড়ে ছিল বিশালাকার মন্দির এবং পূর্ব পার্শ্বে ছিলো মহাকাল দিঘি। এই ঐতিহাসিক দিঘিটি বর্তমানে রাজশাহী কলেজ মাঠের অংশ বিশেষ। যার কিয়াদংশ মাজারের দরগা মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন 'রায় বাহাদুর কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জী'। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও কর্মঠ অধ্যক্ষ। তিনি একাদিক্রমে দুই দফায় (১৮৯৭-১৯১৯ খ্রি. ও ১৯২০-১৯২৪ খ্রি,) প্রায় ২৬ বছর ব্যাপি সুনামের সাথে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

---

[১০] ফজর আলি খাঁন, *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* থেকে মাহবুব সিদ্দিকী কতৃক উদ্ধৃত। দেখুন, মাহবুব সিদ্দিকী, *পূবোক্ত*, পৃ. ৩৬৯।

[১১] *তদেব*, পৃ. ৩৬৮।

অধ্যক্ষ কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জীর আমলে ব্রিটিশ সরকার মহাকাল দিঘি রাজশাহী কলেজের নামে অধিগ্রহণ করে। তাঁর সময়ে (১৯১০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে) বাঁশের ঠেলা গাড়ির সাহায্যে পদ্মা নদী হতে বালি এনে 'মহাকাল দিঘি' ভরাট করে বিরাট ময়দানে পরিণত করা হয় এবং তখন থেকে মাঠটি রাজশাহী কলেজের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে এটি রাজশাহী কলেজের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রতি বছর মহা আড়ম্বরে একাধিক নরবলি দিয়ে মহাকাল দেও মূর্তিকে তুষ্ট করা হতো। সেকারণে গড়ের অধিবাসীদের দেওজাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দৈত্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় বিধানমতে সেসময় উক্ত মন্দিরে নরবলির রেওয়াজ ছিলো। মহাকালগড়ের বিভিন্ন পরিবার থেকে জোর পূর্বক শিশু ধরে এনে নিষ্ঠুরভাবে বলি দেয়া হতো। স্থানীয়রা দেও বা দৈত্য রাজাদের ঈশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করতো। সমগ্র দেওজাতি দেওরাজের অধীন ছিলো। এই দেওরাজের বসতবাড়িটি ছিলো মহাকাল গড়ে ৩০/৪০ বিঘা জমির উপরে।

মহাকালগড়ে ধর্মের নামে অনাচার এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, স্থানটি একটা নরকপুরীতে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন সনাতন হিন্দুধর্মের রীতিনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাকালগড়বাসী নির্মম দানবীয় ও অসামাজিক–অকল্যাণকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। হিংসা–বিদ্বেষ, মিথ্যাচার, ধর্মান্ধতা, মনুষ্যত্বহীনতা, হিংস্রতা সমাজ জীবনকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। নরবলির ভয়ে সমাজে মহা-আতঙ্ক বিরাজ করতো। মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা ছিলো না। মাঝে মাঝে মহাকালগড় মন্দিরে তান্ত্রিক সাধুদের সমাবেশ হতো। তান্ত্রিকরা অনেক সময় ভয়ঙ্কর ও বিভৎস আচরণ করতো। অর্ধনগ্ন 'সাধু পুরুষেরা' বলি দেয়া মানুষের দেহের উপরে বসে মড়ার মাথার খুলিতে মদ পান করতো, আর লাফিয়ে লাফিয়ে কুৎসিতভাবে নাচতো। এদের আচার-আচরণ ছিলো অনেকটা বনবাসী হিংস্র কাপালিক সম্প্রদায়ের মতো।

জনশ্রুতি মতে, এ পরিস্থিতিতে গৌড় অঞ্চল হতে কতিপয় মুসলমান মহাকালগড়ে আসলে রাজার আদেশে তাঁদের মন্দিরে ধরে এনে বলি দেয়া হয়েছিল। এই খবর শুনে হযরত তুরকান শাহ ইসলাম প্রচারের জন্য কয়েকজন মুসলিম মুজাহিদসহ মহাকালগড়ে আসেন। তুরকান (রহ.) এর মহাকালগড়ে আগমন ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। একদিকে তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এ জনপদে প্রথম একজন ইসলাম প্রচারকের পদার্পণ ঘটলো। অন্যদিকে, তিনি নরবলির মতো নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা এবং অনাচার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রথম শহিদ হওয়ারও গৌরব অর্জন করেছিলেন (১২৮৭ খ্রি./৬৮৭ হি.)। হযরত তুরকান শাহ (রহ.) এর পবিত্র মাজার শরিফ রাজশাহী কলেজের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রাচীরের কাছে একটি পুকুরের উত্তর পাড়ে বিদ্যমান আছে। কথিত আছে যে, দরবেশ তুরকান শাহ (রহ.) এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবং ইসলামের সুমহান বাণী এ অঞ্চলে প্রচারের উদ্দেশ্যে শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.) মহাকালগড়ে উপস্থিত হন।

হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.) আউলিয়াকুল শিরোমণি বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর পৌত্র এবং প্রখাত সূফি সৈয়দ আজাল্লাহ শাহ (রহ.)-এর পুত্র। সৈয়দ

আজাল্লাহ শাহ (রহ.)-এর তিন পুত্র যথাক্রমে সৈয়দ মনির আহমদ শাহ (রহ.), হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.) ও সৈয়দ আহম্মদ তন্নরি শাহ (রহ.) ওরফে মিরান শাহ (রহ.)।[১২] হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.)-এর আসল নাম আব্দুল কুদ্দুস। পরে তিনি শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.) নামে অভিহিত হন। রুপোশ ফার্সি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ মুখাবরণকারী ব্যক্তি। এঁরা অধিকাংশই জালালি ফকির নামে প্রসিদ্ধ এবং সুহরাওয়ার্দি সিলসিলাভুক্ত। হযরত শাহ মখদুম রুপস উক্ত জালালি শাখার একজন কামেল মখদুম ছিলেন। ইনিই কালো কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখতেন।[১৩] বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, পিতামহ হযরত আব্দুল কাদের জিলানির মৃত্যুর (১১৬৬ খ্রি.) ৫৪ বছর পরে শাহ মখদুমর জন্ম। তাহলে তাঁর জন্ম তারিখ ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে ধরে নিতে পারি।

মোঙ্গল নেতা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস সাধিত হলে হযরত আজাল্লাহ শাহ (রহ.) সপরিবারে দিল্লিতে এসে আশ্রয় নেন। উল্লেখ্য যে, দিল্লির সুলতান রুকনউদ্দিন ফিরুজ শাহ হযরত আজাল্লাহ শাহ-এর মুরিদ ছিলেন। এখানে কিছুকাল অবস্থানের পর পুনরায় তিনি বাগদাদে ফিরে যান।[১৪] সেই সময় বাংলার শাসক ছিলেন তুঘরিল খান। তিনি দিল্লির সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে বলবন সশরীরে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করতে আসেন। গিয়াস উদ্দিন বলবনের যুদ্ধ যাত্রার সময় শাহ মখদুম তাঁর দুই ভাই ও শতাধিক অনুসারী নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুগামী হন। গিয়াসুদ্দীন বলবনের সাথে যুদ্ধে তুঘরিল খান পরাজিত হলে বলবনের পুত্র বোগরা খান বাংলার শাসক নিযুক্ত হন। শাহ মখদুম বোগরা খানের সঙ্গে গৌড়ে বেশ কিছুকাল বসবাস করেন। এরপর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে গৌড় থেকে বের হয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্র শুরু করে নোয়াখালীর শ্যামপুরে পৌঁছেন। এখানে তিনি তাঁর প্রথম আস্তানা স্থাপন করেন। ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি চলে আসেন কাঞ্চনপুরে, এ জায়গায় একটি খানকা স্থাপন করেন। তাঁর অনুপম চরিত্র ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে শতশত মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এখানে দুই বছর থাকার পর খবর পেলেন যে, গৌড়ের মহাকাল গড়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় সাথী ও বন্ধু তুরকান শাহ ইসলাম প্রচার কার্যে নির্মমভাবে শহিদ হয়েছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর তিনি ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে কিছু সঙ্গী সাথী নিয়ে পাণ্ডুয়াতে আগমন করেন। বাঘার হযরত দিলাল শাহ বোখারী (রহ.) ও হযরত আব্বাস (রহ.), গোদাগাড়ীর হযরত শাহ সুলতান (রহ.) ও পুঠিয়ার বিড়ালদহের হযরত করম আলী শাহ (রহ.), স্বীয় ভাগনে রাজশাহীর বসুয়ার

---

[১২] মুহম্মদ আবদুস সামাদ, *সুবর্ণদিনের বিবর্ণ স্মৃতি*, (রাজশাহী: উত্তরা সাহিত্য মজলিশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩।

[১৩] কাজী মোহম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৭), পৃ. ১৪৪-১৪৫।

[১৪] ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলাদেশের ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ, আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম*, পৃ. ১৩৮।

তৌহিদ শাহ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।[১৫] হিজরি ৬৮৭ সনে বা ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজশাহী থেকে ২৬ মাইল দূরে পদ্মা নদীর ধারে তাঁর আস্তানা স্থাপন করেন ।[১৬] এ স্থানের নাম রাখা হয় মখদুম নগর। বর্তমানে এর নাম 'বাঘা' ।

হযরত তুরকান শাহের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.) শাহ আব্বাসকে মখদুম নগরে খলিফা নিযুক্ত করে অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মহাকালগড়ে আগমন করেন। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত ও সামন্ত জমিদারদের সৈন্যরা তাঁকে বাধা দিলে যুদ্ধ শুরু হয়। কয়েক বছর ধরে (১৩১৯-১৩২৬ খ্রি.) তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধে সামন্তরা পরাজিত হয়। দুই সামন্ত জমিদারসহ বেশ কয়েকটি হিন্দু নাপিত পরিবার ও বহু কৈবর্ত ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মখদুম শাহ রুপোশ (রহ.) এখানে একটি খানকাহ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর খানকা ও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে মহাকালগড়ে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ইসলাম প্রচার শুরু হয়ে যায় এবং এ স্থানে বহু পীর আউলিয়ার আগমন ঘটে। তখন মহাকালগড়সহ এ সমগ্র স্থানের নাম হয় বোয়ালিয়া। ফার্সি 'বো' ও আরবি 'আউলিয়া' শব্দ দুটি দিয়ে 'বোয়ালিয়া' শব্দের উৎপত্তি। বো শব্দটির অর্থ সুগন্ধ (খোস-বো)। তাহলে শব্দগত অর্থ দাঁড়ায় 'আউলিয়াদের সুগন্ধ'।[১৭] বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ইসলাম প্রচার ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অসহায় মানুষের খিদমত করার পর ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দে (৭৩১ হিজরির ২৭ রজব) শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.) তাঁর খানকাহ শরীফেই দেহ ত্যাগ করেন এবং সে স্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৮] শাহ মখদুমের মাজারের প্রবেশ পথে তাঁর ব্যবহৃত একটি কাঠের খড়ম, বসবার পিঁড়ি, একটি ছড়ি ও কয়েকটি পাগড়ি সংক্ষিত আছে। হযরত শাহ মখদুমের ওফাতের বহু বছর পরে ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাট আব্বাসের সেনাপতি আলিকুলি বেগ বোয়ালিয়ায় আসেন এবং দরবেশের সমাধির উপর একটি সুদৃশ্য দরগা (সমাধি সৌধ) নির্মাণ করে দেন। তখন থেকেই মখদুম শাহের দরগার পার্শ্ববর্তী এলাকার নাম হয় 'দরগাপাড়া'।

বোয়ালিয়া

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোথাও শ্রীরামপুর বা বোয়ালিয়া নামের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বোয়ালিয়া কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, চুঁচুঁড়ার গভর্নর ডাচ বণিক Van Den Broke-এর আঁকা একটি মানচিত্রে। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম বাংলার জল ও স্থল পথের এই মানচিত্র অঙ্কন করেন। এই মানচিত্রে বোয়লিয়ার সঙ্গে পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও

---

[১৫] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।

[১৬] মুহম্মদ আবূ তালিব (সম্পা.), *হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.) এর জীবনেতিহাস*, (ঢাকা: পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ১৯৬৯), পৃ. ১০।

[১৭] এবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

[১৮] মুহাম্মদ জোহরুল ইসলাম, *বরেন্দ্র অঞ্চলের সুফি সাধক*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশ, ২০১৬), পৃ. ১২৫।

আসামের স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। এরপর ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৌবাহিনীর সদস্য মেজর জেমস রেনেল বাংলার নদীপথ জরিপ করে একটি নকশা প্রস্তুত করেন। এই নকশায় (১৭৬৪–৭৬ খ্রি.) গঙ্গার (বর্তমান পদ্মা) পার্শ্বের বোয়ালিয়া শহরের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা James Grant তৎকালীন ভরতের গভর্নর জেনারেল কাছে "An Historical and comparative analysis of the finances of Bengal" নামে একটি প্রতিবেদন পাঠান। এ রিপোর্টে রাজশাহীর উপর মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত "The first report from the select committee on the affairs of the East India Company" শীর্ষক প্রতিবেদনে Beauleah সহ গঙ্গার তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ, কাশিম বাজার, কুমারখালী ইত্যাদি সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক শহরের উল্লেখ রয়েছে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মানচিত্রেও রাজশাহী শহরের নাম Beauleah।[১৯]

রামপুর-বোয়ালিয়া

হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.) এর মহাকালগড়ে আবির্ভাব এবং যুদ্ধে বিজয় লাভের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শত বছর ধরে এই শহরের নাম বোয়ালিয়াই থাকে। অবশ্য পরে এর নাম হয় রামপুর–বোয়ালিয়া। খ্রিস্টীয় ১৭ শতকের বিখ্যাত কবি শুকুর মামুদের 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' কাব্যে রামপুর-বোয়ালিয়ার উল্লেখ আছে (১৭০৫ খ্রি.)। তিনি রামপুর-বোয়ালিয়ার অন্তর্গত সিদুঁর কুসুম্বি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর জন্মস্থানে 'শুকুর ফকিরের ভিটা' নামক জায়গায় তাঁর বসতবাটির ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য থেকে তৎকালীন রামপুর–বোয়ালিয়ার ভাষার নমুনা পাওয়া যায়।

W.W. Hunter ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর স্কটিশ ইতিহাসবিদ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সিভিল সার্ভিসের সদস্য ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত দপ্তরের মহাপরিচালক। তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক অবদান হলো The Indian Musulmans গ্রন্থটি। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা 'A Statistical Account of Bengal: District of Rajshahi' নামক গ্রন্থে রামপুর-বোয়ালিয়া শহরের উল্লেখ আছে। রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীকালীনাথ চৌধুরী বৃহত্তর রাজশাহী জেলার (বর্তমান নওগাঁ জেলা) আত্রাই থানার মির্জাপুর গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কৃতবিদ্য কায়স্থ জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কর্মজীবনে দীর্ঘসময় রাজশাহীতে ডেপুটি ইন্সপেক্টর আব স্কুল্স পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই লেখক রামপুর-বোয়ালিয়াকে পদ্মা তীরের একটি অন্যতম প্রধান নগর বলে উল্লেখ করেছেন।[২০] কবি রজনীকান্তের সমসাময়িক

[১৯] এবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯ ও মাহবুব সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।
[২০] শ্রীকালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

কালের লেখক, মেহেরপুরের দীনেন্দ্র কুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩ খ্রি.) রাজশাহী কালেক্টরেটের কর্মচারী ছিলেন। তিনি তিন বছর রাণীবাজার মহল্লার একটি মেসে বসবাস করেছেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের রামপুর-বোয়ালিয়ায় সংঘটিত ভূমিকম্প নিয়ে তিনি 'সেকালেরে স্মৃতি' নামক একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ভূমিকম্পে রামপুর-বোয়ালিয়া শহরের ক্ষয়-ক্ষতির কথা তিনি উল্লেখ করেন। এ সময়ে হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.) এর দরগা (মহাকালগড়) ছিলো শ্রীরামপুর মৌজাভুক্ত। তথাপি মহাকালগড়সহ সমগ্র শহরকে বোয়ালিয়া বলে অভিহিত করা হতো। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলা সদর নাটোর থেকে বোয়লিয়ায় স্থানান্তরিত হলে শ্রীরামপুর মৌজায় সরকারি অফিস-আদালত, জেলখানা স্থাপিত হয়। এরপরে শ্রীরামপুরের শ্রী উঠে গিয়ে এবং বোয়ালিয়ার সঙ্গে রামপুর যুক্ত হয়ে সমগ্র অঞ্চলের নাম হয় রামপুর–বোয়ালিয়া। বর্তমান টিকাপাড়া-মিরেরচকের পার্শ্বে ২৩ ও ২৪ নং ওয়ার্ড এবং প্রাচীন বোস পাড়ার রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারার পাশে ২২ নং ওয়ার্ডের রামপুর বাজার, বোয়ালিয়া থানা, ২০নং ওয়র্ডের বোয়ালিয়া পাড়া, শ্রীরামপুর বলে খ্যাত বর্তমান খ্রিস্টান চার্চসহ দক্ষিণের সমগ্র অংশ এবং তৎসংলগ্ন বোয়ালিয়া ক্লাব আজও রামপুর–বোয়ালিয়ার স্মৃতি বহন করছে।

রামপুর নামের উৎপত্তি

রামপুর-বোয়ালিয়ার পশ্চিমে কুমোরপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে পাল রাজা কুমার পালের রাজধানী ছিলো। এই কুমারপাল পালরাজা রামপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমারপাল। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে কুমার পালের দুটি ঘটনার উল্লেখ আছে। বৈদ্যদেব কুমার পালের মন্ত্রী ছিলেন। কুমারপাল ৫ বছর (আনু. ১১২৪-১১২৯ খ্রি.) বরেন্দ্র শাসন করেন (পূর্বে উল্লেখিত)। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত কাব্যগ্রন্থ ও বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রলিপির প্রমাণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ সমুদয় অঞ্চল পাল রাজা রামপালের শাসনাধীনে ছিলো। রামপুর বা শ্রীরামপুর রাজা রামপালের স্মৃতি বিজড়িত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অপর একটি প্রাচীন মত হলো রামপুর নামটি এসেছে আমপুর থেকে। আমপুর শব্দের অর্থ 'আমে পরিপূর্ণ স্থান'। রাজশাহী অঞ্চল আমের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। একজন গবেষকের ভাষায়, "বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে রাজশাহী ছিলো আম্রবীথিকায় সাজানো এক শহর। সেসময়কার কাজলা, মতিহার, তালাইমারি, মেহেরচণ্ডী, ভদ্রা, বালিয়াপুকুর, শিরোইল, রাণীনগর, রামচন্দ্রপুর, টিকাপাড়া, কাজিরগঞ্জ, খরবোনা, লক্ষীপুর, বুলনপুর, হড়গ্রাম, রায়পাড়া, কাশিয়াডাঙ্গা, মোল্লাপাড়া, বহরমপুর, ডিঙ্গাডোবা, সপুরা, ছোট বনগ্রাম, শালবাগান, বড় বনগ্রাম এ সকল এলাকাসমূহের প্রায় সম্পূর্ণটাই ছিলো আমবাগান।"[২১] স্থানীয় কিছু প্রবীণ মানুষ এখনো রাজশাহী শহরকে আমপুরা বলে অভিহিত করে থাকেন। বরেন্দ্র অঞ্চলে 'অ', 'আ', 'ও', 'র' ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ বিভ্রাট হতে দেখা যায়। যেমন-

[২১] মাহবুব সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

রুটিকে বলে উটি, অযুকে বলে রযু, রাতকে বলে আইত, রোদ কে বলে ওদ, রংপুরকে বলে অংপুর এবং নামের ক্ষেত্রে আফজালকে রফজাল, ওয়াহেদকে রহেদ ইত্যাদি বলতে শোনা যায়। সেভাবে আমপুর উচ্চারণটি অপভ্রংশ হয়ে রামপুর হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য এটি অনুমানমাত্র। বিস্তৃত গবেষণা ব্যতীত এবিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নয়।

স্থানীয় সনাতন হিন্দু শাস্ত্রবিদগণের মতে, রাজশাহী একটি প্রাচীন স্থান। রাজশাহী ছিলো বিরাট রাজার শাসনাধীন মৎস্য রাজ্যের অন্তর্গত। মৎস্য রাজ্যটির নামকরণ বিষ্ণুর মাছরূপী অবতার মৎস্যের নামানুসারে। মৎস্য কূর্মের পূর্ববর্তী অবতার। হিন্দু ধর্মমত অনুসারে বিষ্ণু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। রাম হলেন বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ভারত এবং নেপাল ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশে রামের পূজা প্রচলিত আছে। হিন্দুদের প্রায় সকল শাখা-সম্প্রদায়ে রাম ও কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে পূজা করা হয়। রামের পূজা এ জনপদেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। তাই বলা যায়, শ্রীরামপুর বা রামপুর স্থানগুলো শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি বহন করছে।

রামপুর-বোয়ালিয়ায় জনবসতি এবং মহল্লাসমূহের নামকরণ

মহাকাল গড়ে, আজ যেখানে শাহ মখদুমের দরগা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার দক্ষিণে অতীতে একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ছিলো। সেখানে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বসবাস ছিলো। কালীনাথ চৌধুরী বলেন, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বরেন্দ্র অধ্যুষিত রাজশাহীর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে প্রায় ৬০,০০০ হতে ৭০,০০০ হালিক কৈবর্ত (মাহিষ্য) বাস করতো ।[২২] ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রবল বন্যায় এ অঞ্চলটি পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে গেলে অধিকাংশ হালিক কৈবর্ত বরেন্দ্র এলাকার দিকে প্রস্থান করে। কিছু জেলে কৈবর্ত পরিবার মহাকাল দিঘির উত্তর-পূর্বদিকে সরে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে, আজো ওই স্থানের নাম 'মালোপাড়া' নামে পরিচিত। মালো নামে পরিচিত এসব মৎস্যজীবী পরবর্তী কালে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়।

বর্তমান মাস্টারপাড়ায় বেশ কয়েকঘর নরসুন্দর (হিন্দু নাপিত) বাস করতো। এরা অধিকাংশই ছিলো বৈষ্ণব। এখানকার জনৈক নাপিতের কনিষ্ঠ পুত্রের নরবলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেওরাজার সঙ্গে শাহ মখদুমের সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল। আর যে স্থানে ঘোড়ামারা মহল্লা, সেই জায়গায় অতীতে বহু হিন্দু নমশূদ্রের আবাস ছিলো। এরা ছিলো দেওরাজাদ্বয়ের ভক্ত। এদের সঙ্গেই শাহ মখদুমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কথিত আছে যে, এই যুদ্ধে শাহ মখদুমের একটি ঘোড়া মারা যাওয়ায় ওই মহল্লার নাম রাখা হয় ঘোড়ামারা। কুমারপাড়ায় কুমোরদের বসবাস ছিলো। ঘোষপাড়ায় ঘোষদের (গোপ সম্প্রদায়), আর গোয়ালপাড়ায় গোয়ালাদের বসতি ছিলো। পদ্মানদীর ধারে কুমারপাড়া-আলুপট্টির দক্ষিণে ও ঝাউতলা মোড়ের কাছে বেশ কয়েক ঘর ঘোষ পরিবার গরু লালন পালন ও দুধ বেচাকেনা করে। আজ যেখানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সেখানে ছিলো বিরাট আম বাগান। সেখানে গোয়ালাদের আবাসস্থল ছিলো। বাগানের চারণভূমিতে (বাথান) অনেক

[২২] শ্রী কালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

গরু-মহিষ চরে বেড়াতো। সেখান থেকে এই সমুদয় অঞ্চলের নাম হয় মহিষবাথান। অবশ্য এখন মহিষবাথান বলতে এর একটি ক্ষুদ্র অংশকে বুঝায়।

হযরত শাহ মখদুমের মৃত্যুর প্রায় আড়াই শত বছর পরে হযরত শাহ নূর মহাকাল গড়ে আগমন করেন। তিনি শাহ মখদুমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ মুনির আহমদ (রহ.)-এর বংশধর সৈয়দ কিরণ আহমদ শাহের ঔরশে ১৪৭১ খ্রি. বাগদাদে শাহ নূরের জন্ম। তিনি আনুমানিক ১৫৬৩ খ্রি. সপরিবারে বোয়ালিয়ায় আসেন। ১৫৬৮ খ্রি. তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মাজার মখদুম সাহেবের মাজারের ডান পার্শ্বে। শাহ নূরের বংশধরগণের মধ্যে শাহ মহিউদ্দিন ওরফে ঝুনঝুন মিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গোদাগাড়ীর সুলতানগঞ্জে আস্তানা স্থাপন করে গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সুলতানগঞ্জে তাঁর মাজার আছে। বোয়ালিয়া শহরে ঝুনঝুন মিয়ার বংশধরদের সম্মানসূচক পদবি 'মিয়া' নামে অভিহিত করা হতো। তাঁর বংশের লোকজন বোয়ালিয়ায় যে স্থানে বসবাস করতেন সেই জায়গা মিয়াপাড়া নামে খ্যাতি লাভ করে।[২৩]

আনুমানিক ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে বোয়ালিয়ার মাটিতে প্রথম একজন শিয়া মতাবলম্বী (ইসনে আশারা) মুসলমানের আগমন ঘটে। তিনি পারস্য সম্রাট আব্বাসের সেনাপতি আলিকুলি বেগ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বোয়ালিয়ায় এসে শাহ মখদুমের সমাধির উপর একটি সুদৃশ্য দরগা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তিনি আর স্বদেশে ফিরে যাননি। কিছুকাল বোয়ালিয়ায় মখদুম (রহ.)-এর দরগায় অবস্থান করে বোয়ালিয়ার নিকটবর্তী স্থান কুমোরপুরে গিয়ে আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বোয়ালিয়া ও কুমোরপুরে বহু শিয়া মুসলমানের আগমন ঘটে। হযরত আলিকুলি বেগের মাজার পদ্মা নদীর ধারে কুমোরপুরে অবস্থিত। কে এম মিছেরের বিবরণ থেকে জানা যায়, "রাজশাহীর বোয়ালিয়াতে (হোসেনীগঞ্জ) এক সময় কিছু সংখ্যক শিয়া মুসলমানের বাস ছিলো। কতক বর্গীর হাঙ্গামার আগেই এখানে আসিয়াছিল, আর কতক হাঙ্গামার সময়ে আসিয়াছিল।" অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (বর্গী হাঙ্গামার সময়) মুর্শিদাবাদ হতে শিয়াদের একটি দল বোয়ালিয়ায় আসে। তারা এখানে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ স্থাপন করে, মসজিদ সংলগ্ন একটি প্রস্তর খণ্ডে শিয়াদের প্রচলিত কলেমা উৎকীর্ণ আছে। কালক্রমে এই স্থানের নাম হয় মেহেদিপুর। পরবর্তী কালে (১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের পরে) রামপুর–বোয়ালিয়ায় হিন্দু জমিদারদের আবাস ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে এই জায়গার নাম হয় 'লক্ষীপুর'। বর্তমানে এই নামটি চালু আছে।[২৪] রাজশাহী শহরের ৩/৪ মাইল উত্তর–পশ্চিম কোণে রেল লাইনের ধারে জঙ্গলের মধ্যে এখনও শিয়াদের একটি বহু পুরানো কবরস্থান পরিদৃষ্ট হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরে উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে বেশ কিছু শিয়া মুসলিম পরিবার রামপুর-বোয়ালিয়ায় আসে। এদের কেউ কেউ শিরোইল কলোনি ও আবার কেউ কেউ গণকপাড়ায় বসবাস শুরু করে। গণকপাড়ায় যারা থাকত তারা পেশা হিসেবে ধুনারির কাজ বেছে নিয়েছিল, তাই এ জায়গার

[২৩] মুহম্মদ আবদুস সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬; মুহম্মদ জোহরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭-২৫৯।
[২৪] কাজী মোহম্মদ মিছের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬ ও ১৫০।

নাম 'তুলাপট্টি'। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ থেকে আরও একদল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান (ইসমাইলীয় শিয়া) রাজশাহীতে আসেন। তাঁরা স্বাড়ম্বরে শান্তিপূর্ণভাবে মহররমের মজলিশ, জারি মিছিল বের করতেন এবং কাসিদা গাইতেন। তাঁরা যে জায়গায় মহররমের সময় হযরত হোসেন (রা.)-এর নামে তাজিয়া স্তম্ভ নির্মাণ করে তলোয়ার ও লাঠি খেলার আয়োজন করতেন, সেই স্থান আজও 'হোসেনীগঞ্জ' নামে পরিচিত। রাজশাহীতে মহররমের সময়ে কুস্তি, তলোয়ার ও লাঠি খেলায় যারা সুনাম অর্জন করেছিলেন, এদের মধ্যে দরগাপাড়া মিয়াজান শেখ ও হোসেনীগঞ্জের তুফানির দল উল্লেখযোগ্য। এরা শিয়া ছিলো না। মূলত এরা বংশ পরম্পরায় রুটি বিস্কুটের কারবারি। রামপুর-বোয়ালিয়ায় তখন অনেক পাউরুটি ও বিস্কুটের দোকান ছিলো। যারা বহু রকম রুটি-বিস্কুট বানাত, তারা যে জায়গায় থাকতো, তার নাম ছিলো 'রুটিআলা পাড়া'।[২৫] এ পাড়ার অধিবাসীরা রুটি-বিস্কুট তৈরি করে বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করতো। অতীতে মহররমের সময় এরা 'শেরমাল' বা 'শিরমাল' নামক এক ধরনের সুস্বাদু বড় পাউরুটি ও চিনির তাজিয়া সাঁচ তৈরি করে বেচতো। শিরমাল পারশ্য দেশের জাফরান গন্ধযুক্ত একটি ঐতিহ্যবাহী রুটি। শিরমাল শব্দটি ফারসি ভাষায় 'শির' অর্থ দুধ ও আর 'মালদেয়ন' অর্থ মাখানো বা দলা করা বুঝায়। শিরমাল তৈরির উপাদানগুলো হলো- লবণ, ছোট এলাচ, দারুচিনি গুঁড়া, জায়ফল, কিসমিস, মাওয়া ইত্যাদি। দুধ ও ঘি দিয়ে মাখানো সুজি বা আটার সঙ্গে এ উপাদানগুলো মিশিয়ে শিরমাল তৈরি করা হয়। শিরমাল আবার দুই ধরনের- রওগনি ও গাওযবান। মোগল সম্রাটদের দ্বারা উত্তর ভারতে প্রবর্তনের পর এটি লখনৌ ও হায়দ্রাবাদে একটি জনপ্রিয় ও সুস্বাদু খাবার হয়ে ওঠে। পরে মোগলরা এ খাবার ঢাকায় নিয়ে আসে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে মহররমে তাজিয়া নির্মাণ, জারি মিছিল ও তলোয়ার-লাঠিখেলা প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত রাজশাহী শহরে মহররমের সময় 'শেরমাল' তৈরির প্রচলন ছিলো।

এ অঞ্চলে কবে কখন মাড়োয়াড়ি ও জৈনদের আগমন ঘটেছিল জানা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদল জৈন ব্যবসায়ী রামপুর-বোয়ালিয়ায় আসে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রামপুর-বোয়ালিয়ায় বৌদ্ধ ও জৈনদের সংখ্যা ছিলো ৪৬ জন। জৈন সম্প্রদায়ের কয়েক ঘর অদ্যাবধি এই শহরে টিকে আছে। ঘোড়ামারা এলাকায় ব্রিটিশ আমলে পাটের কারবারি মাড়োয়াড়িদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিমচাঁদ আগরওয়াল ও ভৌরিলাল সেরাওয়াগী। বর্তমানে জৈন্যরা বেশির ভাগ বস্ত্র ব্যবসায়ী। ঘোড়ামারা মহল্লায় জৈনদের ধর্ম মন্দির এবং সাহেব বাজারে তাঁদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। গোদাগাড়ীতে তাঁদের পূর্বপুরুষদের ৪টি 'মৃত্তিকা স্তূপ' আবিষ্কৃত হয়েছে।

রাজশাহী শহরের দক্ষিণে পদ্মা নদীর ধার ঘেঁষে বড়কুঠি অবস্থিত। এ বড়কুঠির নামে মহল্লার নামকরণ হয়েছে 'বড়কুঠি পাড়া'। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক এটি নির্মিত হয়। ওলন্দাজ বণিকগণ এটিকে নীল ও রেশমের ব্যবসার

[২৫] ফজর আলি খাঁন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭১ ও এবনে গোলাম সাসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

কাজে ব্যবহার করতেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের পরে ওলন্দাজদের বড়কুঠি ক্রয় করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানির একজন প্রতিনিধি বাস করতে আরম্ভ করেন বড়কুঠিতে। যাঁর তত্ত্বাবধানে সেখান থেকে রেশম ক্রয় করে আমদানি হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রামপুর-বোয়ালিয়া অঞ্চল থেকে তাঁর ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। এরপর ১৮৩৫ খ্রি. রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানি ইংরেজদের রামপুর-বোয়ালিয়া ও সরদহের কুঠিবাড়িসহ আরো অন্যান্য কুঠি ও কারখানা কিনে নিয়ে নীল ও রেশমের ব্যবসা আরম্ভ করে। পদ্মার বিশাল চর অঞ্চল ছিলো নীল চাষের উর্বর ক্ষেত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই রামপুর-বোয়ালিয়াসহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রামে স্থানীয় বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী রেশমের কারবার করে কারখানার মালিক হয়েছিলেন। ওয়াটসন কোম্পানি এদের কাছ থেকে রেশম সুতা খরিদ করে বাইরের দেশে রপ্তানি করতো।

বর্তমান আলুপট্টির দক্ষিণে সাহেবগঞ্জ ছিলো রামপুর বোয়লিয়ার বড় বাজার এবং রেশম, নীল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় কেন্দ্র। একসময় এখানে রেশম ও নীল ব্যবসার সাথে জড়িত প্রায় ৫০০ সাহেবের বসবাস ছিলো।[২৬] ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় রামপুর-বোয়ালিয়ার হাবাসপুর, নওয়াবগঞ্জ বাজার, বশোড়ি, সাহেবগঞ্জ এসব এলাকায় অবস্থিত কয়েকটি বড় বড় রেশম কারখানা পদ্মার গহ্বরে তলিয়ে যায়, কোনো ক্রমে বড়কুঠি রক্ষা পায়। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের দিকে রামপুর বোয়লিয়ার বড়কুঠি ইংরেজ মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানির (এম জেড কোম্পনি) অধিকারভুক্ত হয়।

রামপুর-বোয়ালিয়ায় (রাজশাহী) পদ্মা নদীর শাখা নদী 'বারাহি'। রেনেলের মানচিত্রে বারাহি নদীর উল্লেখ আছে। ১৮৩৮ ও ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে রামপুর-বোয়ালিয়াতে প্রবল বন্যা হয়। এ বন্যায় ভীষণ জলবিপ্লব ঘটে। এতে পদ্মা নদী ভেসে যায়। কয়েক স্থানে বাঁধ ভেঙ্গে রামপুর-বোয়ালিয়া শহরে পানি প্রবেশ করে। এ বন্যায় শহরের মধ্যস্থলে বারাহি নদী পদ্মার বালুকারাশির চাপে পড়ে নালা বা ড্রেনে পরিণত হয়। এ নালাটি এখন শহরের ১নং ড্রেন নামে খ্যাত। আজ থেকে ১৫০ বছর পূর্বে এ নদীর স্রোতধারা বর্তমান রাজশাহী শহরের সাহেব বাজার, গণকপাড়ার তুলাপট্টি, ষষ্টিতলা, গোরহাঙ্গা, বোয়লিয়া থানা, শিরোইল, ছোটবনগ্রাম, বড়বনগ্রাম হয়ে বায়া দিয়ে নওহাটার কাছে আত্রাই নদীর শাখা বারনই নদীর সঙ্গে মিলিত হতো। মালবাহী বড় বড় নৌকা বারহি নদী দিয়ে চলাচল করতো।[২৭] বায়ার কাছে এ নদীর মরা খাত এখনও বর্তমান। বারাহি ও বারনই নদীর মিলিত মোহনার পাড়ে গড়ে ওঠেছিল ধান-চাল, পাট, তুলার মোকাম এবং গবাদি পশু ও ঘোড়া বেচা-কেনার এক নতুন হাট, এটাই বর্তমানের নওহাটা।

---

[২৬] এবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯।

[২৭] মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ (সম্পা.), *রাজশাহী পরিচিতি*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৭) (ড. তসিকুল ইসলাম শ্রীকালীনাথ চৌধুরী, *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*সহ এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন), পৃ. ২৪১; মাহবুব সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪; কাজী মোহম্মদ মিছের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।

সাহেবগঞ্জ পদ্মায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরে বোয়ালিয়ায় 'সাহেব বাজার' নামে আরেকটি বিকল্প বাজার গড়ে ওঠে। মূলত এ বাজারটি গড়ে উঠেছিল বড় কুঠির সন্নিকটস্থ উত্তর দিকে বারাহি নদীর উভয় পাড়ে। এই বাজার প্রতিষ্ঠায় যিনি প্রথম এগিয়ে আসেন তার নাম নীলমণি পোদ্দার। প্রথমে তিনি একটি টিনসেড ঘর তৈরি করে মনোহারী দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পসময়ের মধ্যে এখানে অনেক ব্যবসায়ীর আগমন ঘটে। একে একে আসেন মোহিনী মোহন সাহা, জামাল ব্যাপারী, কুষ্টিয়ার জয়েন উদ্দীন মিয়া, বস্ত্র ব্যবসায়ী মোহিনী সাহা, স্বর্ণ ব্যবসায়ী ব্রজেন্দ্র স্বর্ণকার (রায় জুয়েলার্স) প্রমুখ। আসেন হেকমতুল্লাহ খলিফা, আলিমুদ্দিন দর্জি প্রমুখ। এরা পিরহান, জুব্বা, কোর্তা, পাজামা-আচকান, টুপি প্রভৃতি বানাতো। এখানে কয়েকজন মাড়োয়াড়ি বণিক ও সাহু (তেলী) সম্প্রদায়ের লোক আসে। উনিশ শতকের শেষার্ধে এই বাজারের গোড়াপত্তন হলে এম জেড কোম্পানির ম্যানেজার মি. অস্টিন একটি স্থায়ী বাজার নির্মাণে এগিয়ে আসেন। তিনি স্থানীয় শিরোইলের জমিদারের নিকট নয় বিঘা জমি ৭০০ টাকায় বন্দোবস্ত নিয়ে একটি পাকা দালানঘর নির্মাণ করেন। তৎসংলগ্ন টিনের চালায় চাল ও ডালপট্টি নির্মাণ করেন। মূল ভবনে কাপড়ের দোকান গড়ে ওঠে এবং মাছ মাংস বিক্রয় শুরু হয়। ক্রমে এ বাজারে ব্যবসায়ীর ভিড় বাড়তে থাকে। ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ি থেকে আসেন ১নং গদির সত্ত্বাধিকারী নঈমুদ্দিন মিয়া এবং আব্দুল হামিদ মিয়া প্রমুখ। এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ শহরে মানুষের আনাগোণা বাড়তে থাকে এবং বাজারের কলেবরও বৃদ্ধি পায়। তখন আস্টিন সাহেব এ বাজারের নামকরণ করেন কোম্পানির সাহেব বাজার।[২৮] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি যুদ্ধের পরে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান হলে বাজারটি শুধু সাহেব বাজার নামে পরিচিতি লাভ করে।

সাহেব বাজারের পার্শ্বে মোহনলালের মোড় (বাটার মোড়) হতে রেশমপট্টির জৈন মন্দির পর্যন্ত মধ্যস্থিত স্থানে 'রাণীবাজার' নামে একটি ছোট বাজার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ বাজারের শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য ও সহযোগিতা দানে এগিয়ে আসেন কাজিরগঞ্জের এক আনির জমিদার বাবু তারণচন্দ্র মণ্ডল। ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের দোকান, মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট, জুতার দোকান, মুদি ও মনোহারী দোকানে (এস কোহেন ওরফে ইহুদি মোনা সাহেবের দোকান) রাণীবাজার প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এভাবে ধীরে ধীরে 'রাণীনগর' নামের একটি মহল্লা গড়ে ওঠে। রাণীবাজার ও রাণীনগর নামগুলো কখন, কিভাবে সৃষ্টি হলো তা বলা কঠিন। তবে রাজশাহীতে তিনজন দানশীলা রাণীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাণীবাজার ও রাণীনগর এদের স্মৃতি বহন করছে।

বোয়ালিয়ায় জমিদারদের কুঠি স্থাপিত হয় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের পর। সুতরাং রাণীবাজার ও রাণী নগর ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের পর কোনো এক সময়ে গড়ে উঠে। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে নাটোর থেকে জেলা সদর দপ্তর স্থানান্তরের পর তৎকালীন বোয়ালিয়া শহরে নাটোর, দিঘাপতিয়া, পুঁঠিয়া,তাহিরপুর, দুবলহাটি, কাশিমপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারেরা

[২৮] মুহম্মদ আবদুস সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭।

তাঁদের আবাসন স্থাপন করতে শুরু করে। এদের মধ্যে দিঘাপতিয়া ও পুঠিয়ার জমিদার বংশ শহর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পুঠিয়ার জমিদারদের মধ্যে রাণী মনমোহিনী দেবী, মহারাণী শরৎ সুন্দরী ও মহারাণী হেমন্ত কুমারী অনেক জনহিতকর কাজের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এ. সি. এডওয়ার্ড অধ্যক্ষ থাকাকালে পুঠিয়ার রাণী মনোমেহিনী দেবী রাজশাহী কলেজকে বিশ হাজার টাকা দান করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর অনুদানে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী কলেজে বি এল কোর্স চালু করা হয়।

স্বামী যোগেন্দ্র নাথের মৃত্যুর পর রাণী শরৎ সুন্দরী পুঠিয়ার জমিদারী লাভ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লির দরবার হতে মহারাণী উপাধি পান। রাণী শরৎ সুন্দরী রাজশাহী কলেজের প্রশাসন ভবন নির্মাণে বিরাট অবদান রাখেন। তিনি তৎকালীন রাজশাহী এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এ সুরম্য অট্টালিকা তৈরিতে দশ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। মহারাণী শরৎ সুন্দরীর পুত্র যতীন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে ঢাকার মানিকগঞ্জের বিশিষ্ট জমিদার ভূবনমোহন রায়ের কন্যা হেমন্ত কুমারীর বিয়ে হয়। মদ্যপান ও অসৎ সঙ্গের কারণে কুমারের শরীরে নানান জটিল রোগ দানা বাঁধে। অবশেষে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অল্প বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মহারানী শরৎ সুন্দরীর মৃত্যুর পর হেমন্ত কুমারী পুঠিয়ার জমিদারী লাভ করেন। তিনি শাশুড়ির কৃতকর্ম অনুসরণ করে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিও মহারাণী উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর অবদানের কথা রাজশাহীর ইতিহাসের পাতায় শুধু নয়, শহরের পথে-প্রান্তরে তাঁর কৃতিত্বের চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁকে রাজশাহীর কিংবদন্তীর রাণী বলা চলে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পরিশ্রমে রামপুর–বোয়লিয়ায় একটি রেশম ট্রেনিং ও প্রযুক্তি স্কুল স্থাপিত হয়। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি 'ডায়মণ্ড জুবিলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় হেমন্তকুমারী নিজে ছয় হাজার টাকা দান করেন। রাজশাহী কলেজের হিন্দু ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য তিনি এগিয়ে আসেন এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের স্টেট সেক্রেটারি বরাবর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগস্ট হেতেম খাঁ মৌজায় দুই বিঘা পৌনে ছয় কাঠা জমি দান করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে আঠারো হাজার টাকা ব্যয়ে 'হেমন্তকুমারী হিন্দু হোস্টেল' নির্মিত হয়। এ হোস্টেল নির্মাণের সমুদয় অর্থ মহারাণী নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করেন। রাজশাহী কলেজ চত্বরের পূর্ব পাশে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি ভবনে প্রথম চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এটি ওঠে আসে নবনির্মিত ভবনে। এটি এখন সদর হাসপাতাল নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে গ্রাম থেকে রোগীদের থাকার জন্য হাসপাতাল ভবনের পূর্বদিকে দুটি টুইন কোয়ার্টার নির্মিত হয় রাণী হেমন্তকুমারীর অর্থায়নে। এ ছাড়া তিনি ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে সতেরো হাজার টাকা ব্যয়ে রাজশাহী শহরে হেমন্ত কুমারী 'সংস্কৃত কলেজ' ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তাঁর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে 'হেমন্ত কুমারী ওয়াটার ওয়ার্কস' উল্লেখযোগ্য (১৪ আগস্ট, ১৯৩৭)। তাই মানব কল্যাণে তাঁর ভূমিকা ও অবদানের কথা স্মরণ করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'রাণীবাজার' ও 'রাণী নগর' নামগুলো মহারাণী হেমন্ত কুমারীরই স্মৃতি বহন করছে।

রাজশাহীর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নাটোর একটা খুব প্রাচীন জনপদ। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে পদ্মায় মহাপ্লাবন দেখা দিলে বন্যার জলে নারদ নদে প্রচণ্ড জলস্ফীতি ঘটে। নাটোর শহরসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ব্যাপকভাবে জলমগ্ন হয়। এ অবস্থায় অনেকদিন নাটোর শহর জলমগ্ন থাকে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নাটোরের নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা প্রকট হয়ে উঠে। ফলে কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। মানুষজনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে কোম্পানি সরকার ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে নাটোর থেকে বোয়ালিয়ার শ্রীরামপুরে জেলা সদর দপ্তর স্থানান্তর করে। ওই বছর বোয়ালিয়াতে প্রথম জেলখানা স্থাপিত হয়। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে জেলার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড এই শ্রীরামপুর মৌজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। শ্রীরামপুর জনপদের প্রাচীন মহল্লা কাদিপুর, নবীনগর, হাবাসপুর, বশোড়ি ও নওয়াবগঞ্জ বাজার এলাকায় কালেক্টরেট, জেলা জজ আদালত, জেলখানাসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তর এবং মসজিদ, মন্দির, পাঠশালা, স্কুল গড়ে উঠে। তখন নাটোর থেকে বহু প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিজাত সম্প্রদায়, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, পুলিশ, ব্যবসায়ী তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে রামপুর-বোয়ালিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। সে সময়ে নাটোর, দিঘাপতিয়া, পুঁঠিয়া, তাহিরপুর, দুবলহাটি, কাশিমপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণও নতুন জেলা শহরে তাদের আবাস নির্মাণ করেন। কিন্তু ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় শ্রীরামপুরের সরকারি ও সেরকারি অনেক অবকাঠামো (প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) পদ্মার গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়। অবশ্য, শ্রীরামপুরের মিশন হাসপাতাল, ক্রিশ্চিয়ান চার্চ, বোয়ালিয়া ক্লাব, কামারুজ্জামান পার্ক বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ভাটাপাড়াসহ সমুদয় অঞ্চল এই বন্যা থেকে থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ভাটাপাড়ায় প্রচুর ইট ভাটা ছিলো। এজন্য মহল্লার নাম 'ভাটাপাড়া'। ভাটাপাড়া ছাড়াও আরো একটি স্থানে ইট পেড়ানো হতো। সেটা হচ্ছে- 'বালিয়া পুকুর'। বালিয়াপুকুর এলাকায় অজস্র পুকুর ও ডোবা ছিলো। এসব ডোবা ও পুকুরের খননকৃত মাটি দিয়েই কাঁচা ইট তৈরি করে ভাঁটায় পোড়ানো হতো। রামপুর-বোয়ালিয়ায় নতুন নতুন স্থাপনা তৈরিতে এসব ইট ব্যবহৃত হতো। পরবর্তী সময়ে এসব ডোবা ও পুকুরগুলো বালি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হয়। তখন থেকে এই মহল্লার নাম হয় 'বালিয়াপুকুর'। রাজশাহীতে সরকারি সিদ্ধান্তে (১৮৫১ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) বুলনপুরে নতুন করে জেলা প্রশাসনিক কার্যালয় নির্মাণ শুরু হয়। এখানে জজকোর্ট নির্মিত হয় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীরামপুরে অবস্থিত 'বাউলিয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল' (১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। এরপর প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়।

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে রামপুর-বোয়ালিয়াতে প্রথম জেলখানা স্থাপিত হয়। জেলখানার কর্মকর্তা-কর্মচারী, কারারক্ষী বা সিপাহিদের পরিবার পরিজনদের বসবাসের জন্য জেলখানার উত্তর পার্শ্বে সরকার অস্থায়ী কলোনি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের নামেই 'সিপাই পাড়া' নামকরণ হয়েছে। এছাড়া, রাজশাহী কলেজের ছাত্রী নিবাসের আশেপাশের সমগ্র এলাকার পূর্বনাম ছিলো 'সিরুসার পাড়া'। সিরুসার নামে এক সুন্দরী বাঈজীর নিবাস ছিলো এখানে।

সে শহরের অভিজাত লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য তার বাড়িতে নাচ গানের আসর বসাতো। তার নামে এ স্থানের নামকরণ হয়েছিল 'সিরুসার পাড়া'।

রামপুর-বোয়ালিয়ায়র শ্রীরামপুরে এক উন্মুক্ত জায়গায় এক সময়ে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। রেশম ও নীল কুঠির সাহেবেরা প্রতিবছর জাকজমকপূর্ণভাবে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করতেন। এ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো জুয়ার আসর বসতো। এতে মোটা অংকের বাজি ধরবার ব্যবস্থা ছিলো। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসত ঘোড়-দৌড় দেখতে ও বাজি ধরতে। যে ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো সেটাকে বলা হতো 'রেসকোর্স ময়দান'। বর্তমানে রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় উদ্যান (শহিদ এএইচএম কামারুজ্জামান পার্ক) গড়ে ওঠেছে।[২৯]

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের পরে নবাবের পক্ষাবলম্বনকারী পরাজিত আমির, জায়গিরদার, রাজকর্মচারী, বিচারক, মোল্লা-মুন্সি, আলেম, ব্যবসায়ীসহ নানান পেশাজীবী মানুষ মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে পদ্মা পেরিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলে চলে আসে। এদের কিয়াদংশ গোদাগাড়ী হয়ে বোয়ালিয়ায় এসেছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) দুর্ভিক্ষ এ অঞ্চলে মুসলমানদের আগমনকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে প্রসিদ্ধি এই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মারা যায়। বাংলার দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ জীবন বাঁচার তাগিদে পদ্মা নদী পেরিয়ে রামপুর-বোয়লিয়া অঞ্চলে চলে আসে। এরপর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ এতদাঞ্চলে মানুষের আগমন আরো বাড়িয়ে দেয়। সিপাহি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ভারতে মুসলমানদের অবস্থা নানাদিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ বিদ্রোহের জন্য একমাত্র মুসলমানদেরকে দায়ী করে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের প্রতি কঠোর দমন-পীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে। বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি এলাকায় মুসলমান সিপাহিদের হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয়, সিপাহিদের পরিবারের লোকজনদের খুঁজে বের করে হত্যার পর গুম করে ফেলা হয় এবং তাঁদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ সময়ে ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি এলাকার অনেক বিদ্রোহী মুসলিম তাঁদের পরিবার পরিজন নিয়ে এ শহরে চলে আসে। এভাবে রামপুর-বোয়ালিয়ায় অধিক সংখ্যক মুসলমান মোহাজেরের উপস্থিতি এক গৌরব যুগের সূচনা করে। তখন এসব মোহাজের পরিবার পদবি অনুসারে শহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁদের বসতবাটি নির্মাণ করতে শুরু করে দেয়। এদের নামের প্রভাবে শহরের বিভিন্ন মহল্লা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যেমন মুহম্মদপুর, আহম্মদপুর, সফুরা, শেখপাড়া, মুন্সিডাঙ্গা, কাজীহাটা, সুলতানাবাদ, মোল্লাপাড়া, কাজিরগঞ্জ ইত্যাদি। বর্ধমানের জমিদার কাজি মুহম্মদ ইয়াহিয়ার কাচারি বাড়ির (গুল গফুর ফুয়েল পাম্প) স্মৃতিতে 'কাজির গঞ্জ' (কাদির গঞ্জ) মহল্লার নামকরণ হয়েছে।

১৭৪২ হতে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবাব আলিবর্দি খান বাংলায় মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মারাঠা দস্যুরা বাংলাদেশে 'বর্গী' নামে সমাধিক

[২৯] এবনে গোলাম সাসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

পরিচিত। গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরের জেলাগুলোতে মারাঠা বর্গীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তারা হুগলী, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে লুটতরাজ চালায় এবং ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমান তাঁদের পরিবার পরিজন নিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পদ্মা নদীর পাড়ি দিয়ে গোদাগাড়ী ও রামপুর-বোয়ালিয়াতে আশ্রয় নেয়।[৩০] এজন্য গোদাগাড়ীকে বলা হতো 'ভাগনগর'। এদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ীও ছিলো। এরা রামপুর-বোয়ালিয়ায় ছোট ছোট দেশীয় কোম্পানি গঠন করে ইউরোপীয় কোম্পনির মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। এঁদের মধ্যে লাল বিহারী বাবু, কার্তিক শাহ, কোকারাম মণ্ডল, দুলাল সাহা ও খেতু বাবু মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে আসেন। দুলাল সাহা সপুরাতে কুঠি স্থাপন করেন, সপুরার মঠ নির্মাণ ও 'সপুরা দিঘি' খনন তাঁর অবদান, খেতু বাবু আলুপট্টির কুঠির পাশাপাশি সিরোইলেও রেশম কারখানা স্থাপন করেন। খেতুবাবুর অমর কীর্তি হলো শিরোইলের 'মঠপুকুর' খনন ও শিব মন্দির নির্মাণ। মাতৃভক্ত খেতুবাবু মায়ের শেষ ইচ্ছে পূরণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এ বৃহদাকার পুকুরটি খনন করে পুকুরপাড়ে শিব মন্দির বা মঠ নির্মাণ করে দেন। এভাবে এ মহল্লার নাম হয়েছে 'মঠপুকুর'।[৩১]

১৮৫০ সাল থেকে রামপুর-বোয়ালিয়ায় ওয়াহাবি আন্দেলন শুরু হয়। ওয়াহাবিরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে এ অঞ্চলে আসে। ব্রিটিশ সিভিলিয়ন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর বিখ্যাত দি ইন্ডিয়ান মোসলমান্স গ্রন্থে রাজশাহী জেলার ওয়াহাবিদের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। রাজশাহী জেলা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে প্রথম ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার করেন হযরত মৌলানা বেলায়েত আলি ও হযরত মৌলানা এনায়েত আলি।[৩২] প্রাচীন কাগজপত্রে সপুরায় একটি প্রাচীন ওয়াহাবি মসজিদ ও তৎসংলগ্ন একটি মাদ্রাসার উল্লেখ আছে। সপুরার মিয়া পাড়ায় (সপুরা দিঘির উত্তর-পূর্ব কোণে ইদগাহের পাশে) মসজিদটি অবস্থিত, মসজিদটি ওহাবিদের প্রথম নির্মিত মসজিদ এবং ওহাবি মতবাদ প্রচার কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। জানা যায়, মৌলানা এনায়েত আলি তাবলিগি দাওয়াতের কাজে বোয়ালিয়ায় এলে এলাকার প্রভাবশালী সরদার হাজি ঝাবু সরদার ও ঝাগু সরদার তাঁর হাতে বায়'আত হন। ঝাবু সরদারকে তিনি অত্র এলাকায় খলিফা নিয়োগ করেন। ঝাবু সরদার একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন- যা বহুকাল ধরে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিলো। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ফেব্রুয়ারি মসজিদের পশ্চিম দেয়ালস্থিত মিহরাব গাত্র হতে একটি শিলালিপি উদ্ধার করা হয়। এটি বর্তমানে বরেন্দ্র মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। তাতে সাল লিখা আছে ১২১৮ হিজরিতে (১৮০৩ খ্রি.) মসজিদটি নির্মিত হয়। কয়েক বছর পূর্বে মসজিদটি ভেঙ্গে সেখানে তাওহিদ ট্রাস্ট, ঢাকার সৌজন্যে একটি বড়ো মসজিদ নির্মিত হয়েছে। পরে ঝাবু সরদারের পুত্র হাজি মুনিরুদ্দিন

---

[৩০] সৈয়দ গোলাম হেসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ারুল মুতাখ্খারিন* (আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া অনু.), (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ২৭৩।

[৩১] কাজী মোহম্মদ মিছের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১; মাহবুব সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫ ও ২৮৭।

[৩২] এবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

সর্দারজি সেখানে একটি মাদ্রাসা কায়েম করেন। ছয় বিঘার একটি পুকুরসহ চব্বিশ বিঘা জমি পরিবেষ্টিত এই মাদ্রাসাটি মূলত জিহাদ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে পুরোটাই সপুরা হাউজিং এস্টেটের দখলীভুক্ত।[৩৩] সপুরা মাদ্রাসা কোরান, হাদিস, ফার্সি ব্যকরণ ও হিসাব শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। রাজশাহী শহরে ওয়াহাবি আন্দেলনের নেতৃত্বদানকারী ছিলেন হাতেম আলী খান। তাঁর নামে মহল্লার নামকরণ হয় 'হাতেম খান' বা 'হেতেম খাঁ'।[৩৪] পরবর্তীতে ওহাবি মতবাদ প্রচরের জন্য হেতেম খাঁ মহল্লায় একটি মসজিদ (হেতেম খাঁ ছোট মসজিদ) ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়, এখানে আরবি, ফার্সি ও কোরান হাদিস ও দর্সে নিজামিয়া পড়ানো হতো।[৩৫] বর্তমানে মাদ্রাসাটি চালু আছে। প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ বলেন, "এই ওহাবি আন্দোলনের পথ ধরেই এদেশে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ সুন্নি মুসলমান সম্প্রদায়, যা এখন আহাল-ই-হাদিস সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত।"[৩৬] তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং নেতা ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে সুশৃঙ্খলভাবে কার্য পরিচালনা করে। সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় এখন রাজশাহীতেও তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে রাজশাহীর নওদা পাড়ায় (আম চত্বর) রয়েছে আহলে হাদিস আন্দোলনের প্রধান প্রচার কেন্দ্র ও আহলে হাদিস যুব সংঘ এবং এই স্থানে একটি বিশালাকার মাদ্রাসাও স্থাপন করা হয়েছে। রাণীবাজারে আহলে হাদিস মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদ্রাসাটি বেশ পুরানো। সালাফে সালেহিনের অনুসারী হওয়ার কারণে তাঁরা নিজেদের সালাফি নামেও পরিচয় দেন।

বোয়ালিয়ায় তাঁতি বা তন্তুবায় শ্রেণির বসবাস একেবারে কম ছিলো না। ভেড়িপাড়া, কারিগর পাড়া,রেশমপট্টি, শিরোইল, সাগর পাড়া (আরজি শিরোইল), টিকা পাড়া মিলে বিপুল সংখ্যক তাঁতি পরিবারের বসবাস ছিলো। তাঁতি ছিলো দু ধরনের, কেউ কেউ সুতি বস্ত্র তৈরি করতো, কেউ কেউ রেশমি সুতা বুনতো। এবনে গোলাম সামাদ বলেন, ভেড়ি পাড়ায় ভেড়ার লোম দিয়ে কম্বল তৈরি হতো। তাই এ মহল্লার নাম 'ভেড়িপাড়া'। কম্বল যারা বানাতো, তারা সবাই ছিলো ভারতের বিহার থেকে আগত হিন্দু তাঁতি।[৩৭] কাদিরগঞ্জ গোরস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে 'কারিগর পাড়া'। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, কারিগর পাড়ার আদি নাম 'জোলা পাড়া'। এখানে বেশ কয়েকঘর মুসলমান জোলাহ বা তাঁতির বসতি ছিলো। এদের আত্মীয় পরিজন রাজশাহীর বানেশ্বরেও বসবাস করতো। এসব জোলাদের আদি নিবাস সম্ভবত মুর্শিদাবাদে। কারিগর পাড়ায় শত শত তাঁতি চরকায় কার্পাস তুলো থেকে সুতো কেটে গামছা, ধুতি, শাড়ি, মশাড়ি প্রভৃতি সুতি বস্ত্র তৈরি করতো। তখন বোয়ালিয়ার

---

[৩৩] মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *আহলে হাদীছ আন্দোলন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ*, (রাজশাহী: হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১), ২য় সং, ১ম সং ১৯৯৬, পৃ. ৪৪৯-৪৫০।

[৩৪] মুহম্মদ আবদুস সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

[৩৫] কাজী মোহম্মদ মিছের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

[৩৬] এবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

[৩৭] *তদেব*, পৃ. ১০৮-১০৯।

আশেপাশে অধিকাংশ গ্রামেই কার্পাস তুলার চাষ হতো। কার্পাস তুলা চাষের উন্নতির জন্য তাহিরপুরের জমিদার রাজা বাহাদুর শশী শেখরেশ্বর রায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রাজশাহীর কাপাসিয়ায় ছিলো কার্পাস তুলোর বড় আড়ৎ। কার্পাস থেকেই স্থানটির নাম 'কাপাসিয়া'।

পূর্বে শিরোইল ও রেশমপট্টির নাম ছিলো 'তাঁতিপাড়া'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রেশমপট্টি, শিরোইল, সাগর পাড়া এবং টিকা পাড়া এলাকায় একাধিক রেশম কারখানা ও আড়ৎ ছিলো। কারখানাগুলোতে শত শত তাঁতি সুতা কাটতো এবং তা দিয়ে রেশম কাপড় প্রস্তুত করতো। এদের অধিকাংশই ছিলো মুসলিম। রাজশাহী সরকারি শিরোইল হাই স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠটি ছিলো প্রায় পাঁচ বিঘা আয়তন বিশিষ্ট একটি পুকুর। বিশাল এই পুকুরটির নাম ছিলো তাঁতি পুকুর। এই পুকুরের চতুর্পার্শ্বে শত শত তাঁতি পরিবারের বসবাস ছিলো। ১৯৬৭-১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে শিরোইল সরকারি হাইস্কুল নির্মাণের প্রাক্কালে মাঠটি ভরাট করে ফেলা হয়।"[৩৮] ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা ছিলো রেশম উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান। এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের রেশম উৎপাদিত হতো। ইংরেজ রেশমতত্ত্ববিদগণ স্বীকার করেছেন, বাংলা হলো ভারতবর্ষের 'রেশম ভাণ্ডার'। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বগুড়া, রামপুর-বোয়ালিয়ার নদী-তীরবর্তী দোআঁশ মাটিতে তুঁত গাছের ফলন অত্যন্ত বেশি হতো। আবার এই কয়েকটি জেলার মধ্যে রেশম উৎপাদনে রামপুর-বোয়লিয়া শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। এসব অঞ্চলে নানান শ্রেণির কীট বা পলুর চাষ হতো। যেমন- সোনামুখী, আলতাপাটি, আসল দেশী, সাহেব দেশী, দাগি, নারী, খুদিস্তানি, বড় পলু ও বাণেশ্বরী। রামপুর-বোয়ালিয়ায় অন্যান্য কীটের সাথে বাণেশ্বরী কীটেরও প্রচুর পরিমাণে চাষ হতো। বাণেশ্বরী কীটের আরেক নাম সোয়ানা কীট। এর বৈজ্ঞানিক নাম *বম্বেস্ক সিনেনসিস* একটি ল্যাটিন শব্দ। এর রেশম সুতা কিছুটা মলিন ও শ্বেত বর্ণের হয়।[৩৯] জনশ্রুতি মতে, এ সুতা বেচা-কেনার জন্য রামপুর-বোয়লিয়ায় যে স্থানে রেশম বাজার গড়ে ওঠেছিল, সেই জায়গার নাম 'বানেশ্বর'। এছাড়া, টিকাপাড়ায় আরো এক শ্রেণির ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিলো। এরা হুক্কায় তামাক জ্বালাবার জন্য অঙ্গারদি দ্বারা তৈরি এক ধরনের বটিকা প্রস্তুত করে বিক্রি করতো। এ বটিকাকে 'টিকা' বলা হয়। এই টিকা থেকে 'টিকাপাড়া' নামের উৎপত্তি।

'বেল' ও 'দার' দুটি শব্দ থেকে বেলদার শব্দের উৎপত্তি। ফার্সি বেল অর্থ 'কোদাল'। বেলদার শব্দের আরেকটি অর্থ হলো 'খনক' অর্থাৎ যারা কোদাল দিয়ে মাটি কেটে জীবিকা নির্বাহ করে। বেলদার হলো একটি হিন্দু জনগোষ্ঠীর নাম। এদের প্রধান পেশা ছিলো পুকুর, জলাশয়, দিঘি, ইঁদারা খনন, মাটি কেটে রাস্তা তৈরি করা। অনেকে খড়ির ব্যবসা করতো। এছাড়া, কাঁচা পায়খানা (সার্ভিস পায়খানা) নির্মাণ ও চাড়ি বানানোও এদের কাজ। এদের আদি নিবাস উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেলদারি

[৩৮] মাহবুব সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।
[৩৯] কে এম মিছের, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।

ভাষাভাষীর (এক প্রকার মিশ্র হিন্দি) লোকজন মুর্শিদাবাদে আসে। পরে এরা সেখান থেকে রামপুর-বোয়ালিয়ায় এসে বসবাস শুরু করে। এরা যে স্থানে বসবাস শুরু করে সেই জায়গার নাম হয় 'বেলদার পাড়া'। এরা শহরের সার্ভিস পায়খানা, পাতকুয়া, ইঁদারা প্রভৃতি তৈরি করে। এছাড়া পদ্মা নদীতে বাঁধ নির্মাণ এবং বহু পুকুর-দিঘি তাদের দ্বারা খননকৃত। বেলদারদের খননকৃত দিঘি-পুকুরের মধ্যে শিরোইল মঠপুকুর, লক্ষীপুরের বুড়ি পুকুর, পুলিশ লাইন পুকুর, ছয়ঘাটি দিঘি, হড়গ্রামের রাণীপুকুর, শিরোইলের কাঁচা বাজারের টোডরমল পুকুর, হাতিডোবা পুকুর (বর্তমানে শিরোইল বাস টার্মিনাল), আরডিএ পুকুর (বর্তমানে আরডিএ মার্কেট), সোনাদিঘি (জুবিলি ট্যাঙ্ক), আমির মিয়ার পুকুর, চৌধুরী পুকুর, অচিনতলা পুকুর, গুড়ি পুকুর, সপুরা দিঘি, ছয়ঘাটি দিঘি, কাইয়ুম ডাক্তারের পুকুর, তাঁতি পুকুর, তারণ বাবুর পুকুর, মেহেরচণ্ডী দিঘি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আদিতে কাইয়ুম ডাক্তারের পুকুরকে 'সাগর দিঘি' বলা হতো। ওই সাগর দিঘির নাম থেকেই বর্তমান 'সাগর পাড়া' নামের উৎপত্তি। আর তারণ বাবু ছিলেন রাজশাহীর জমিদার। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে (অন্যমতে, ২৪ এপ্রিল) নগরীর কাদিরগঞ্জ মহল্লার অন্তর্গত তারণ বাবুর বিশাল বাগানের ওপর দশ একরের বৃক্ষশোভিত সুনিবিড় ছায়াঘেরা জমিতে রাজশাহী মহিলা কলেজটি স্থাপিত হয়।

রামপুর-বেয়ালিয়ার সর্ববৃহৎ দিঘি হচ্ছে মেহেরচণ্ডী দিঘি। শহরের বোয়ালিয়া থানাধীন মেহেরচণ্ডী মহল্লার উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে এটি অবস্থিত। জনশ্রুতি মোতাবেক এলাকার জোতদার চণ্ডীদাস দিঘিটির খনন করেন। খননকাজ শেষ করার পরেও যখন দিঘিতে পানি উঠছিল না। এতে চণ্ডীদাস মহা ভাবনায় পড়ে যান। ওই রাতেই তিনি স্বপ্নে দেখেন কে যেনো তাকে কানে কানে বলছে- "বৎস, কোনো সদ্য বিবাহিত পুরুষ যদি স্ত্রীসহ পুকুরের চারিধার একবার প্রদক্ষিণ করে আসে, তবেই তোমার পুকুরে জল উঠবে।" এমতাবস্থায়, তিনি অনুসন্ধান চালিয়ে নিজ এলাকায় মেহের আলি নামে একজন সদ্য বিবাহিত পুরুষকে পেয়ে যান। স্বপ্ন মোতাবেক দিঘি প্রদক্ষিণের জন্য চণ্ডীদাস তাঁকে অনুরোধ করেন। মেহের আলি রাজি হন, তবে একটি শর্তে। শর্তটি হচ্ছে, যদি পুকুরে পানি আসে পুকুরটির নামকরণে তাঁর নাম যুক্ত করতে হবে। চণ্ডীদাস এতে সম্মত হন। মেহের আলি যথরীতি নবপরিনীতা স্ত্রীকে নিয়ে পুকুরটি প্রদক্ষিণ করলেন। পুকুর জলে ভরে গেল। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক চণ্ডীদাস নিজের নামের সাথে মেহেরের নাম যুক্ত করে দিঘির নাম রাখলেন মেহেরচণ্ডী দিঘি।[৪০] পরবর্তী কালে দিঘির নামে মৌজা ও গ্রামের নাম হয়ে গলে 'মেহেরচণ্ডী'।

ষষ্ঠীতলায় রয়েছে তিনটি মন্দির। ষষ্ঠীতলা দুর্গা মন্দির (জেলে পাড়া), ষষ্ঠীতলা তারেকেশ্বর শিব মন্দির (অলকার গলি) ও ষষ্ঠীতলা আদি কালীমাতা মন্দির। স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, ষষ্ঠীতলা আদি কালীমাতা মন্দিরটি বেশ পুরানো। একসময় এ জায়গায় ছিলো বিশাল এক বট বৃক্ষ ও অশ্বত্থ গাছ। বট-অশ্বত্থ তলায় ছিলো একটি ছোট্ট মন্দির, এ মন্দিরে ষষ্ঠী দেবীর পূজো করা হতো। এজন্য কালক্রমে এ মহল্লার নাম হয়েছে 'ষষ্ঠীতলা'। ষষ্ঠীদেবী সনাতন

[৪০] মাহবুব সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮-২৮৯।

(হিন্দু) ধর্মবলম্বীদের এক পৌরাণিক দেবী। সনাতন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মতে, এই দেবীর কৃপায় নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান লাভ হয় এবং তিনিই সন্তানের রক্ষাকত্রী। প্রতি মাসের শুক্লা পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এ দেবীর পূজো করা হয়।

রামপুর-বোয়ালিয়ায় এক এক পেশার মানুষ সাধারণত শহরের এক এক এলাকায় বাস করতো। যারা বাজারে সব্জি বেচতো, তারা থাকতো সব্জি পাড়ায়। যারা সরষে থেকে তেল বানাতো তারা থাকতো সাহাজি পাড়ায়। রাজশাহীর কাছে পদ্মায় এক সময় প্রচুর ইলিশ ধরা পড়তো। শহরের কাছ ঘেঁষে নদীর ধারে ছিলো মুসলমান জেলে পল্লি। এ জায়গার নাম 'মাছুয়া পাড়া'। শহরে আরও কয়েকটি মৎস পল্লি আছে। এগুলোর মধ্যে বৃহৎ পল্লিটির নাম 'মহলদার পাড়া'। এখানকার বাসিন্দারা মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থেকে এসে রামপুর-বোয়ালিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল। এরা একতাবদ্ধ এবং কঠোর পরিশ্রমী। এদের মধ্যে ধনীরা সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত এবং সমাজসেবী ও রাজনীতি সচেতন। এদের অনেকে সাহিত্যিক, শিক্ষক, রাজনীতিক ও আইনজীবী হিসেবে শহরে সুনাম অর্জন করেছেন। নবাবি আমল থেকে গঙ্গা, পদ্মা ও ভাগিরথীর বিশাল জলমহাল এদের পূর্বপুরুষদের অধিকারে ছিলো।

দৈনিক বার্তা ভবনের স্থানটি ছিলো বিশাল পাটের গোডাউন ও রেশম কুঠি। তৎসংলগ্ন স্থানটি বাসুনিয়া বা কাসারি পট্টি। এর সন্নিকটের জায়গাটির নাম 'আলুপট্টি'। এই স্থানে আলুর বড় মোকাম ছিলো বলে এর নাম আলুপট্টি। তখনো শহরের আশেপাশে ব্যাপকভাবে আলুর চাষ শুরু হয়নি। উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে আলু বোঝাই পালতোলা নৌকা জাহাজঘাট, নুনগোলা ঘাট ও সাহেবগঞ্জ ঘাটে এসে ভিড়তো। এরপর তা এসে জমা হতো আলুপট্টি মোকামে।

বিনোদ বিহারী বাবু রামপুর-বোয়ালিয়ায় বড় পাটের কারবারি ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে পাট সংগ্রহ করে পদ্মার জাহাজঘাট দিয়ে নৌকা যোগে হুগলি ও কলকাতার পাটকলগুলোতে তা রপ্তানি করতেন। তাঁর ছোটখাট জমিদারিও ছিলো। তিনি রামপুর-বোয়ালিয়ায় যে স্থানে বসবাস করতেন সে স্থান 'বিনোদপুর' নামে খ্যাত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্থানে মতিহার হল সেই স্থানেই মতিহার বলে একটি গ্রাম ছিলো। শোনা যায়, মতিহার গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে বিশাল ভূ-সম্পত্তির (আম বাগান) মালিক ছিলেন বিনোদ বাবু, পরে সেই জমি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধিগ্রহণ করেছিল।

রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজটি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেই স্থানটি নাটোরের মহারাজা বীরেন্দ্র কুমার রায়বাহাদুরের (ছোট তরফ) পরিত্যক্ত কাচারি বাড়ি।[৪১] এর পাশে একটি উন্মুক্ত জায়গা ও একটি পুকুর ছিলো (আমীর মিয়ার পুকুর)। রাজা–রাণী মাঝে মধ্যে নাটোর থেকে এসে এখানে অবকাশ যাপন করতেন। তাঁরা হাতির পিঠে সওয়ারি হয়ে যাতায়াত করতেন। খোলা জায়গায় রাজার হাতি বাঁধা থাকতো। প্রায়শ হাতির মাহুত হাতিকে পুকুরে নামিয়ে দিয়ে গোসল করাতো। এই রাজার হাতি থেকে মহল্লার নাম হয়েছে 'রাজার হাতা'।

---

[৪১] আনারুল হক আনা, *রাজশাহী মহানগরীর কথা*, (রাজশাহী: আলীগড় লাইব্রেরি, ২০০৪), পৃ. ৪৪০।

রাণীবাজার-স্টেশন রোডের পার্শ্বে ষষ্ঠীতলা মহল্লায় 'রাজা প্রমদানাথ টাউন হল' নামে একটি ঐতিহ্যবাহী বিনোদন কেন্দ্র ছিলো। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এটি 'রাজশাহী টাউন হল' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজশাহী এসেসিয়েশনের সদস্যদের অনুপ্রেরণায়, চেষ্টায় ও সহযোগিতায় 'ভিক্টোরিয়া ড্রামাটিক ক্লাব' কর্তৃক 'রাজশাহী টাউন হল' নির্মিত হয়। প্রশস্ত এই হলটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায়বাহাদুর ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্র কুমার রায়। বস্তুত এই টাউন হলটি ছিলো রাজশাহী শহরের রাজনীতি, সভা-সমিতি, সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রস্থল। এখানেই রাজশাহী এসেসিয়েশনের অধিবেশন ও সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হতো। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ('মডার্ন রিভিউ', 'ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ', 'প্রবাসী' ইত্যাদি) নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, কলকাতার চলচ্চিত্র ও মঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ, নৃত্যশিল্পী ও সঙ্গীত তারকারা রাজশাহী টাউন হলের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। শিল্পী ও নাট্যকার শিশির কুমার ভাদুড়ী ও নটসূর্য অহিন্দ্র চৌধুরী এখানে প্রদর্শিত নাটকে অভিনয় করেছিলেন। রাজশাহীতে আগমন ঘটেছিল ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের। মুসলিম ক্লাবের উদ্যোগে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর রাজশাহী টাউন হলে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। কবিকে দেখবার জন্য দলে দলে লোক সভায় হাজির হয়। এর মধ্যে ভদ্রমহিলার সংখ্যাই ছিলো দুই হাজারের অধিক। ১৩ পৌষ ১৩৩৫ (২৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রি.) তারিখে কলকাতার 'সাপ্তহিক সওগাত' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সংবর্ধনা সভায় কবি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃব্য প্রদান করেন। এছাড়া তিনি গান গেয়ে জনসাধরণকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেন। পরবর্তী কালে দেনার দায়ে ড্রামাটিক ক্লাবের টাউন হল নিলামে উঠে। দিঘাপতিয়ার রাজপরিবারের অনুদান (এগারো হাজার টাকা) এবং বাবু রাখাল চরণ মণ্ডল, বাবু সুদর্শন চক্রবর্তী, বাবু মহেন্দ্র কুমার সাহা চৌধুরী, বাবু ভবানী গোবিন্দ চৌধুরী, বাবু দূর্গাদাস ভট্টাচার্য প্রমুখের প্রচেষ্টায় এবং সংগৃহীত অর্থে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল রাজশাহী এসেসিয়েশন তিন হাজার একশত টাকায় টাউন হল নিলামে ক্রয় করে। যাহোক, তখন থেকে রাজশাহী টাউন হল রাজশাহী এসেসিয়েশনের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী এসেসিয়েশনের সাতান্নতম বার্ষিক সভায় রাজশাহী টাউন হলের নামকরণ করা হয় রাজা প্রমদানাথ টাউন হল। রাজশাহীবাসী ও রাজশাহী এসোসিয়েশনের প্রতি দানশীল রাজা প্রমদানাথ রায়বাহাদুরের অবদানের কথা স্মরণ রেখে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য এই নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। রাজা প্রমদানাথ ছিলেন রাজশাহী এসেসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৮৭২ খ্রি.)। তিনি দিঘাপতিয়ার প্রজাবৎসল রাজা প্রমথনাথ রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সপুরার জমিদার শ্রী রূপেন্দ্র নারায়ণ ভাদুড়ী রাজশাহী এসোসিয়েশনের কাছ থেকে লিজ নিয়ে রাজশাহী টাউন হলকে সিনেমা হলে রূপান্তরিত করেন। তিনি নিজের নামানুসারে এর নাম দেন রূপেন সিনেমা হল। এই হলে প্রথম নির্বাক ও পরে সবাক সিনেমা প্রদর্শিত হয়। পরবর্তী কালে কলকাতার এ.কে. রায় তাঁর কন্যা অলকা রায়ের নামানুসারে হলটির নামকরণ করেন 'অলকা সিনেমা'। ধীরে ধীরে হলের সামনের রাস্তার মোড়টি 'অলকার মোড়' নামে খ্যাতি লাভ করে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে রাজশাহী এসেসিয়েশনের এক সভায় হলটির নাম বদলিয়ে

রাখা হয় 'স্মৃতি সিনেমা হল'। ২৯ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে পুরনো ভবনটি ভেঙ্গে তদস্থলে রাজশাহী এসোসিয়েশন কর্তৃক একটি বহুতল ভবন (ছয়তলা) নির্মাণ শুরু করে। এসোসিয়েশনের তদানীন্তন সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল নব নির্মিত ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। নির্মাণাধীন ভবনটির নামকরণ হয় রাজশাহী এসেসিয়েশন ভবন।

গোরহাঙ্গা গোরস্থানটি বেশ পুরানো। অনেকে মনে করেন গোর শব্দ থেকে মহল্লার নাম হয়েছে 'গোরহাঙ্গা'। কিন্তু গৌরাঙ্গ বসাকের নামে মহল্লার নাম হয়েছে গৌরহাঙ্গা বা গোরহাঙ্গা। গৌরাঙ্গ বসাক ছিলো নাটোরের অধিবাসী। ব্রিটিশ আমলে সেই সপরিবারে রাজশাহী চলে আসে এবং নিউমার্কেটের মেইন গেটের বিপরীত দিকে কয়েকটি পাকাঘর ভাড়া নিয়ে তাড়ি-মদের ব্যবসা শুরু করে। তখন নিউমার্কেটের জায়গাটিতে ছিলো একটি বিরাট বেশ্যাপল্লি। এরকম পরিবেশে তার তাড়ির ভাটিতে জনসমাগম বাড়তে থাকে। তার ব্যবসা জমজমাট হয়ে ওঠে। সে অত্যল্প সময়ে বিরাট অর্থ বিত্তের মালিক বনে যায়। বেশ্যাখানায় ও মদের ভাটিতে আগত খদ্দেররা এবং টাঙ্গা ও রিকশাওয়ালাগণ স্থানটিকে গৌরাঙ্গের মোড় নামে অভিহিত করতে থাকে। গৌরাঙ্গের মোড় থেকে গৌরহাঙ্গা মোড় বা গোরহাঙ্গা হয়।[৪২] সাহেব বাজারে গৌরাঙ্গ বসাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র দিলীপ কুমার বসাকের (ডি.কে বসাক) নামে একটি ইলেক্ট্রোনিক্স ও মদের দোকান ছিলো।

রামপুর-বোয়ালিয়া একটি হিন্দু প্রধান অঞ্চল। প্রথমদিকে তাঁদের মৃতদেহ সৎকার করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান ছিলো না। হিন্দুরা সাগরপাড়ার দক্ষিণে নদীর ধারে চিতা সাজিয়ে শবদাহ করতো। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে মৃতদেহ পোড়ানোর স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয় তালাইমারীতে। তালাইমারী শ্মশানটি ডোম ঝণ্ডলাল ও বুজিলালের কর্তৃত্বাধীনে ছিলো। পরে শ্মশানঘাট স্থানান্তরিত হয় বোসপাড়া-গাড়োয়ান পাড়ার দক্ষিণে নদীর ধারে হরিসাধুর আশ্রমে। আশ্রমটির নাম ছিলো 'পঞ্চবটি'।[৪৩] এর নামানুসারে স্থানটির নামকরণ 'পঞ্চবটি'। পঞ্চবটি আশ্রমটি আরও একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী রামপুর-বোয়ালিয়ায় এসেছিলেন। পঞ্চবটী ময়দানে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বোস পাড়ার পুরানো নাম ছিলো রামচন্দ্রপুর। পূর্বে এ মহল্লায় বোস বা বসু পদবিধারী অভিজাত ব্রাহ্মণ হিন্দুদের বসবাস ছিলো। তাদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য এতটা প্রকট ছিলো যে, তাদের এলাকায় কোনো মুসলমান বা তফসিলি হিন্দুর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো। বর্তমানে এরা ভারতে গমন করেছে। বোসপাড়ায় এখন অভিবাসী সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। অন্যদিকে, পাঠান পাড়ায় ছিলো পাঠানদের বসবাস। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে পাঠান মুল্লুক আফগানিস্তান থেকে দলে দলে কাবুলিওয়ালা বাংলায় আসতো। এদের পরণে ছিলো ময়লা ঢিলাঢালা জামা, মাথায় পাগড়ি আর ঘাড়ে থাকতো ঝুলি। এরা স্বদেশ থেকে আনা

[৪২] মাহবুব সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩।
[৪৩] ফজর আলি খাঁন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩।

মশলা, শুকনো ফল (কাজু, পেসতা, কিশমিশ, মাওয়া, আখরোট ইত্যাদি), তসবি, রুমাল, জায়নামাজ, আতর গ্রামাঞ্চলে ফেরি করে বেড়াত। পাঠানমুল্লুক থেকে এসে কাবুলিওয়ালারা রামপুর-বোয়ালিয়ায় যে স্থানে আস্তানা গেড়েছিল সে স্থানের নাম 'পাঠানপাড়া'।

রাজশাহীতে বেশ ক'টি মেথর বা হরিজন পল্লি রয়েছে। মেথর শব্দটি ফার্সি 'মিহথর' শব্দ থেকে উৎপন্ন। রাজশাহী শহরে হেতেম খাঁর 'সাজি পাড়া', বুলনপুর (আইডি), কামারুজ্জামান পার্কের গেটের বিপরীত দিকে 'বাগান বাড়ি', পবা থানার কাছে 'শিল্পী পাড়া', 'বুধপাড়া, প্রভৃতি জায়গায় মেথর বা হরিজন পল্লি আছে। মেথররা ধাঙড় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। একটি পেশজীবী সম্প্রদায় হিসেবে ধাঙড়রা শহর, নগর বা জনবহুল এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করতো। এদের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিলো বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী কারহা উপত্যকায়। এরা জীবন ও জীবিকার তাগিদে দাক্ষিণাত্য ছেড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে নাটোর থেকে জেলা সদর স্থানান্তরিত হলে অফিস-আদালতের বহু পরিচ্ছন্ন কর্মীর পরিবার রামপুর বোয়লিয়ায় চলে আসে। এরা মেথর ও ডোম। তবে স্বল্প সংখ্যক মেথর ও ডোম পূর্ব থেকেই বোয়ালিয়ায় বসবাস করতো। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে রামপুর-বোয়ালিয়ায় মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের পর নগর জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটিও পৌর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ধাঙড়রা বেতনভোগী শ্রমিক বা দিনমজুরির ভিত্তিতে ময়লা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নেয়। এরা তেলেগু-হিন্দি-উর্দু মিশ্রিত এক বিচিত্র ভাষায় কথা বলে।

কোর্ট বুলনপুরের দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ ভূমিতে একটি বৃহৎ মাছের বাজার গড়ে ওঠেছিলো। পরবর্তীতে এ বাজারকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছিল একটি গ্রাম। চতুস্পার্শ্বে সাদা কাশফুলে ভরা পদ্মা নদীর ধারের এ গ্রামটির নাম ছিলো ফুলনগর। পরে অপভ্রংশ হয়ে গ্রামটির নাম হয় বুলনগর। বুলনগরে হিন্দু তফসিলি অনগ্রসর চাঁই সম্প্রদায়ের বসবাস ছিলো। কৃষিকাজ ও মৎস শিকার এদের প্রধান জীবিকা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম এবং বর্তমান বাংলাদেশে চাঁই সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। চাঁই হলো দণ্ড বিশিষ্ট মাছ ধরার জাল। আমরা জানি, কোনো সম্প্রদায়ের নামকরণের পেছনে তাদের পেশা বা জীবিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাঁই সম্প্রদায়ের নামও তাদের জীবিকার অবলম্বন চাঁই থেকে উৎসারিত। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্প ও বন্যায় বুলনগর গ্রাম পদ্মা গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অবশ্য গ্রামের উত্তরের কিছু অংশ রক্ষা পায়। এই অবশিষ্ট অংশটুকুতে বাজার ও গ্রাম স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকে স্থানটি বুলপুর বা বুলনপুর নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। এছাড়া, রামপুর-বোয়ালিয়ার কোর্ট এলাকায় গুড়ি নামে আর এক জেলে গোষ্ঠী বসবাস করতো। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পরে এরা ভারতে চলে যায়। এদের নামানুসারে মহল্লাটির নাম হয় 'গুড়িপাড়া'।[৪৪]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের উত্তর প্রদেশের বালিয়া থেকে আগত আরেকটি মুসলমান সম্প্রদায় রামপুর-বোয়ালিয়ায় এসে ভিড় জমায়। এরা রাজশাহী শহরে টমটম

[৪৪] আনারুল হক আনা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

গাড়ি প্রচলন করে। জমিদার ও বিদেশী বণিক সম্প্রদায় এবং কালক্রমে সাধারণ মানুষের চলাচলের প্রধান বাহন হয়ে ওঠেছিল এই টমটম। ব্রিটিশ বণিকেরা ঘোড়া গাড়িকে ট্যানডেম (Tandem) বলতো। মুসলমানেরা ট্যানডেমকে টমটম উচ্চারণ করতো। সাধারণত টমটম চালকেরা মুসলমানই হতো। তবে হিন্দু ধর্মের তফসিলি সম্প্রদায়েরও কিছু টমটম চালক ছিলো। এরা ভারতের উত্তর প্রদেশের বালিয়া, বিহারের পুর্ণিয়া ও ছোট নাগপুর থেকে এসেছিল। এদের বলা হতো দোসাদ। এদের মুখের ভাষা ছিলো দোহাতি- হিন্দি ও সদরি-হিন্দি। দোসাদরা ছট পুজো (সৌর দেবতার পুজো) করতো। এরা গণকপাড়ায় বসতি স্থাপন করেছিল। এখানকার 'হুনুমানজি আখড়া' এরাই স্থাপন করে। অভিজাত জমিদারদের মনোরঞ্জনের জন্য শহরের বড় গণিকালয়টিও গড়ে ওঠেছিলো এই মহল্লায়। এছাড়া, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রামপুর-বোয়ালিয়ার নিউমার্কেট এলাকা, রাজশাহী কলেজের মহিলা হোস্টেলের সংলগ্ন এলাকা এবং শহরতলীতে (বায়া, নওহাটা ও খড়খড়ি) বেশ কয়েকটি পতিতাপল্লি গড়ে ওঠেছিল। জনৈক গবেষকের ভাষায়, "রাজশাহী একটা বড় শহর ছিলো না। কিন্তু এই ছোট শহরেও ছিলো একাধিক গণিকা পল্লী। ঠিক শহরের মাঝখানেই ছিলো একটা বড় গণিকালয়। এখন এলাকাটিকে বলে 'গণক পাড়া'।"[৪৫] দোসাদদের অধিকাংশ দেশ বিভাগের পর ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। টমটম চালকদের কোচওয়ান বলা হতো। কোচওয়ান শব্দটির উৎপত্তি ইংরেজি Coachman থেকে। টমটম চালকদের নিবাস ছিলো রাজশাহী শহরের তালাইমারী, রাণীনগর, বেলদারপাড়া, খরবোনা, বুলনপুর, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি এলাকায়। শহরের বাইরে কাঁঠালবাড়িয়া, নওহাটার মথুরা, কাটাখালি, বানেশ্বর, সরদহ, পবার আব্ধার কোঠা ও হরিপুরে কোচওয়ানরা বসবাস করতো। রাজশাহী শহওে টমটম স্ট্যান্ড ছিলো জিরো পয়েন্ট এবং কলেজিয়েট স্কুলের সামনের মাস্টার পাড়ায়।

ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন এবং বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পলের আমলে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল রামপুর-বেয়ালিয়ায় মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ বাবু হরগোবিন্দ সেন ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান। তখন পৌরসভার কোনো বিল্ডিং না থাকায়, রাজশাহী কলেজ থেকেই এর কার্যক্রম পরিচালিত হতো। কালীনাথ চৌধুরী লিখেছেন, "বর্তমানে জজ আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল বাবু ভুবনমোহন মৈত্র ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মে হইতে চ্যায়ারম্যানের কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভুবন বাবু সহরের এবং জনসাধারণের উপকারের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি রেশম স্কুলে (ডায়মন্ড জুবিলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সার্ভে ইন্সটিটিউট) তিন হাজার টাকা এবং মালোপাড়া জুবিলি বাগান প্রস্তুতের জন্য তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন।"[৪৬] সমসাময়িক কালের একজন লেখক ফজর আলি খাঁন লিখেন, "অনুমান ৭০ বৎসর হইল চলনের জমিদার ভুবন মোহন মৈত্রেয় মালোপাড়ায় যেখানে একটি ডোবা ও গুলির আড্ডা ছিলো সেখানে ভুবন মোহন পার্ক স্থাপন

[৪৫] এবনে গোলাম সামাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।
[৪৬] শ্রী কালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০।

করেন। শহরের চাহিদা হিসাবে ইহা অত্যন্ত ছোট হইলেও বর্তমানে ইহাই একমাত্র পার্ক।"[৪৭] ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৬০ বছর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রচেষ্টায় যে ডায়মন্ড জুবিলি ইন্ডাসট্রিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৮৯৮ খ্রি.) সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সে সময়ই হয়তো এ স্থানটিকে জুবিলি গার্ডেন নামে পার্ক বানানোর পরিকল্পনা করা হয় এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ভুবন মোহন মৈত্র পৌরসভার চেয়ারম্যান হবার পর তা বাস্তবায়িত হয়। পার্কটি গত চল্লিশের দশকেও জুবিলি গার্ডেন নামে পরিচিত ছিলো। পার্কটির প্রতিষ্ঠাতা ভুবন মোহন মৈত্রেয়ের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির পূর্বে বা পরে এর নামকরণ করা হয় 'ভুবন মোহন পার্ক'। সেই সঙ্গে এই এলাকার নাম হয় 'মালোপাড়া ভুবন মোহন পার্ক'।

রামপুর-বোয়ালিয়ায় অভ্যন্তরীণ যানবাহন হলো জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে গরুগাড়ি। বহুকাল ধরে রামপুর-বোয়ালিয়ায় প্রধান বাহন ছিলো গরু বা মহিষের গাড়ি। পঞ্চবটির উত্তর দিকে রামচন্দ্রপুরের 'গাড়েয়ান পাড়া' আজো সেই স্মৃতি বহন করছে। এরপরে চালু হয় ঘোড়াগাড়ি ও পালকি, পরবর্তীকালে রিকশা। মোগল, সুলতানি, নবাবি ও ব্রিটিশ আমলে বাংলার গ্রামে গঞ্জে পালকির প্রচলন ছিলো। অন্যান্য অঞ্চলের মতো রামপুর-বোয়ালিয়াতেও দীর্ঘদিন ধরে বিয়ে ও অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠান এবং অসুস্থ রোগী বহনের জন্য পালকির ব্যবহার চালু ছিলো। পরবর্তী কালে শহরে পালকির বিকল্প হিসেবে শুরু হয় রিকশার প্রচলন। ১৯৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী শহরে বেশ কয়েক মাইল পিচঢালা রাস্তা ছিলো। তাসত্ত্বেও শহরে মাত্র দুটি প্যাডেল চালিত রিক্শা ছিলো। রাজশাহী কলেজের শিক্ষকগণ রিকশা দুটি ব্যবহার করতেন। বলা বাহুল্য, তখন অভিজাত শ্রেণি বলতে রাজশাহী কলেজের শিক্ষকগণকেই মনে করা হতো। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই শহরে রিকশার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

রাজশাহী শহরের শিরোইল বাস টার্মিনালের বিপরীত দিকে রেলওয়ে স্টেশনটি অবস্থিত। এ রেলওয়ে স্টেশনটি ঈশ্বরদী-পদ্মা ব্রিজ হয়ে সরাসরি ঢাকার সাথে যুক্ত। আবার ঈশ্বরদী–পাকশির হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হয়ে খুলনার সাথে সংযুক্ত। বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিম অঞ্চলের সদরদপ্তর স্টেশন কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি রেলপথটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিলো। প্রথম ভাগটি ছিলো পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা স্টেশন (বর্তমানে শিয়ালদহ) থেকে পদ্মানদীর দক্ষিণ তীরের দামুকদিয়া ঘাট পর্যন্ত ১৮৫ কিলোমিটার। এরপর নদী পারাপারের জন্য ফেরি ছিলো। উত্তরবঙ্গ রেলপথের ৩৩৬ কিমি মিটারগেজ লাইনটি পদ্মার উত্তর তীরের সাঁড়াঘাটকে শিলিগুড়ির সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল। কলকাতা-শিলিগুড়ির মূল লাইনটি পর্যায়ক্রমে ব্রড গেজে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। অন্যদিকে সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোম্পানি ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ লাইনটি নির্মাণ করে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আব্দুলপুর-আমনুরা শাখা লাইনের (ব্রড গেজ লাইন) স্টেশন হিসেবে রামপুর-

[৪৭] ফজর আলি খাঁন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩।

বোয়ালিয়া রেলওয়ে স্টেশন চালু হয়। স্টেশনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছিল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ। অবশ্য, আনুষ্ঠানিকভাবে স্টেশনটি যাত্রা শুরু করে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে।

রামপুর এবং বোয়ালিয়া নামক দু'টি অনগ্রসর গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আজকের এই রাজশাহী শহর। প্রাথমিক পর্যায়ে শহরটি রামপুর-বোয়ালিয়া নামে অভিহিত হলেও পরবর্তীকালে রাজশাহী নামটি সর্বসাধারণের নিকট সমধিক পরিচিতি লাভ করে। রামপুর-বোয়ালিয়া নামটি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সরকারিভাবে প্রচলিত ছিলো। শহর হিসেবে রাজশাহী নামটি লক্ষ্য করা গেছে রেল স্টেশনের নামকরণের মধ্য দিয়ে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রেল স্টেশন চালু হলে এর নাম রাখা হয়েছিল 'রামপুর-বোয়ালিয়া স্টেশন'। এর পরপরই আবার স্টেশনের নাম রাখা হয় 'রাজসাহী স্টেশন'। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাজনের পর রাজশাহীকে পূর্ব-পাকিস্তানের একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত করা হয়। এই বিভাগের সদর-দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী শহরে। তখন রাজসাহী স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে বর্তমান বানানে লেখা হয় 'রাজশাহী স্টেশন'। এরপর থেকে রামপুর-বোয়ালিয়ার বদলে শহরের নাম লেখা শুরু হয় 'রাজশাহী'।